॥ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ॥

শ্রী কিরণ মৈত্র

বারো ঘণ্টা

কিরণ মৈত্র

রাইটার্স কর্ণার
এ-৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
ক লি কা তা :: ১২

প্রকাশক : প বি ত্র কু মা র দা স
এ-৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
ক লি কা তা :: ১২

প্রচ্ছদশিল্পী : শৈলেশ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদব্লক ও মুদ্রণ : রয়েল হাফটোন কোম্পানী

মুদ্রক : শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
ক্যালকাটা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা : ৯

দাম মাত্র পাঁচ সিকা

ভূমিকা

শ্রীকিরণ মৈত্র নবীন নাট্যকার। তাঁর বারো ঘণ্টা নামক এক অঙ্কের নাটকখানি পড়ে আনন্দ পেলাম। আজকার দিনের একটি বাঙ্গালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের যে চিত্র তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর এই নাটকে, তা কল্পনা নয়, মর্মন্তুদ বাস্তব। অনুরূপ সংসার আজকার সমাজে খুঁজে বার করতে হয় না, হামেসাই চোখে পড়ে। সমাজ জীবনের প্রতিফলন যদি নাটকের বড় কাজ হয়, তবে সেই গুণের জন্য এই রচনাটিকে অবশ্যই নাটক বলা যায়।

এই নাটকে জীবন-দর্শনের পরিচয় রয়েছে, চরিত্রগুলির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, কোনটিই কল্পিত নয়। আজকার বাঙ্গালীর সমাজে ওই ধরণের তরুণ তরুণী প্রৌঢ় বৃদ্ধ প্রত্যহই দেখা যায়। সবগুলি চরিত্রই প্রচণ্ড একটা আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ রাষ্ট্র-সমাজ সম্বন্ধে বুলি আওড়াচ্ছে না, শ্লোগান দিচ্ছেনা। অথচ নাটকের ভিতর দিকে প্রকাশ পাচ্ছে মূল গল্পটি কোথায়। এইটিই হচ্ছে প্রচারণাবিহীন নাটকের লক্ষণ।

নাটকটি মনকে অবসন্ন করে না। দুঃখের এলোমেলো আঘাতে এ নাটকের নায়ক ভগবানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনে না, মানুষের বিরুদ্ধেও না। দুঃখ দৈন্যে সে স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে আত্মবিনাশের কথা ভাবে না, ভাবে বংশধরদের কথা, সৃষ্টিধরদের কথা, বিশ্বাস রাখে চিরঞ্জীব হবার সম্ভাবনার ও সঙ্কল্পের কথা। নাটকের তাও একটা বড় গুণ, সে গুণ এই নাটকের রয়েছে।

কিছু লঘু চরিত্র এ নাটকে আছে। সব নাটকেই থাকে। মানব চরিত্রের ওই ভাবনাবিহীন ভেসে বেড়াবার প্রবৃত্তির পরিচয় যদি সমাজকে প্রতিফলিত না করে শুধু বৈচিত্র্য পরিবেষণের জন্যই দেওয়া হতো তাহলে

লঘু চরিত্রগুলি নিবর্থক হতো। এ নাটকের লঘু চরিত্রগুলিও মনের গভীর স্তরকে নাড়া দেয়। এও নাটকের একটা গুণ।

গুণের কথা বললাম। এইবার দোষ ত্রুটির কথা বলি। পৃথিবীর খুব কম নাটকই দোষত্রুটি বিবর্জিত। এ নাটকেও ত্রুটি রয়েছে। প্রবেশ-প্রস্থানে এবং ঘটনা-স্থাপনে যে স্বৈরাচার করা হয়েছে, নাটকের পক্ষে তা নিন্দনীয়। ওর অপরিহার্যতা সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব না হলেও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকা আবশ্যক। নাটকে তা নেই। ঘটনা সংস্থাপনের এই স্বৈরাচার একাঙ্ক নাটকের স্বধর্মকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। ঘটনা ঘটেনি, ঘটানো হয়েছে।

আর দুটি ত্রুটি হচ্ছে, প্রথমত অলকের অ্যাকসিডেণ্ট আর দ্বিতীয়ত অনিলের চুরি। কৃত্রিম উত্তেজনার সহায়তায় নাটককে তোলবার চেষ্টা সফল হয়নি, নাটকে ওর দাবী নেই।

অনিলের চুরির ব্যাপারটা হয়েছে ওর চেয়েও দুর্বল। অমিয় অবশ্যই বলতে পারে—"কি তুই! দিনরাত বাড়ীতে বসে আছিস! রোজগার পাতি করবার নাম নেই। দরকারের সময় কটা টাকা জোগাড় করে আনতে পারিস নে! কি তোরা!" অমিয় যে অবস্থায় পড়ে ও কথা বলেছিল, সে অবস্থায় অমন কথা অবশ্যই বলা যায়। যেমন বলা, অনিলের তেমন ছোটা এবং পরেই সুটকেশভরা টাকার সন্ধান পাওয়া, ছিনিয়ে নেওয়া এবং ছেনতাই টাকা এনে দাদাকে দেওয়া, ধরা পড়া অথবা ধরা দেওয়া প্রভৃতি খুবই দুর্বল।

অনিলের চুরি স্বাভাবিক হতো যদি সিনেমা দেখবার ভান করে সমরের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে রাধার জন্য কমলা কিনে এনেছিল যে মন নিয়ে, যে মন নিয়ে মেডেল দিয়ে দুধের দেনা শোধ করেছিল আসলে রাধার জন্য আধসের করে দুধ পাবার আগ্রহে, সেই মনকে খেলিয়ে খেলিয়ে সুটকেশ ছিনিয়ে নেবার প্রবৃত্তিকে উস্কে তোলা হতো। দাদার কথা শুনে নয়, ব্যর্থতার পীড়া থেকে তার মন যদি বিকৃত হতো, তাহলে তা অস্বাভাবিক হতো না

মেলোড্রামা সৃষ্টির কারণও করা যেতো না। কিন্তু এক অঙ্ক করবার তাগিদে যা করা হয়েছে তাতে করে একাঙ্কেও ত্রুটি ঘটেছে, নাটকতাও ক্ষুন্ন হয়েছে।

এই সব ত্রুটি অক্ষমতার পরিচয় নয়, অনভিজ্ঞতার পরিচয়। অভিজ্ঞতা অর্জন করলে নাট্যকার তাঁর ভবিষ্যৎ রচনাকে ও ধরণের ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। তাঁর লেখবার শক্তি এবং দেখবার দৃষ্টি আছে। তিনি জয়ী হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। ইতি

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৮ — শচীন সেনগুপ্ত

মুখবন্ধ

বিধায়ক বাবুকে একদিন বলতে শুনেছিলাম, 'নাটক যেখানে কথা বলে, নাট্যকারের সেখানে চুপ করে থাকাই উচিত।' কারণ নাট্যকারের যা বক্তব্য তা নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ বা সংলাপের মধ্যেই শায়িত থাকে। তবুও নাটক সৃষ্টির আগে বা পরে নাট্যকারের মনে যে ভাবনা জাগে তা জানবার বা জানাবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ দর্শক, পাঠক বা নাট্যকারের মধ্যে থেকে যায়। ভূমিকা লেখবার রেওয়াজটা তা' থেকেই বোধ হয় এসেছে।

লিখতে বসে আমার প্রথম মনে হয়েছিল, যা লিখবো তা যেন বাস্তবিক হয়। অর্থাৎ তাদের কথা আমি বলব যাদের আমি একজন। তাই মধ্যবিত্ত জীবন বর্তমান নাটকের উপজীব্য হয়েছে। যেটুকু কল্পনার রঙ না চড়ালে নাটক হয় না ততটুকুই রঙ চড়িয়ে মধ্যবিত্ত মানুষদের হাজির করেছি।

দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে বিস্তৃত পটভূমিকায় যে কাহিনীর শুরু ও শেষ তার স্থান উপন্যাসে, নাটকে নয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে যা ঘটতে পারে তার একটা সামগ্রিক চিত্র আঁকাই নাটকের দায়িত্ব। তাই মাত্র বারো ঘণ্টার একটি কাহিনী আমার এই নাটকের বিষয়বস্তু।

তৃতীয়ত, নাটক দেখতে বসে মনে হয়েছে যাদের আমি মঞ্চে দেখছি অভিনয় করবার দায়িত্ব যেন প্রধানত তাদেরই। যাঁরা ভেতরে আছেন বা মঞ্চ থেকে ভেতরে চলে যাচ্ছেন বা মঞ্চে আসবার প্রয়োজন যাঁদের নেই তাদেরও অভিনয় করবার একটা দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে এ কথা নাট্যকাররা যেন ভুলে যান। ফলে যতক্ষণ যে চরিত্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি কথা বলছে ততক্ষণই দর্শকরা সেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন, পরে আর সেই

বোধটা থাকে না। এ দিকে আমি দৃষ্টি রাখতে চেয়েছি। ফলও পাওয়া গেছে। মাঝে মাঝে নেপথ্য-চরিত্র রাধার আর্তনাদ ভেসে আসছে, উন্মত্ত রাজেশ্বরের চীৎকার শোনা যাচ্ছে, জানালার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে যেন অনিল, সন্ধ্যা, অমিয়, ডাক্তার আর সকলে রাধার কাছে এসে বসছে, চলে যাচ্ছে এমনি বহু নেপথ্যাভাস নাটকটার রস ও গতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, অভিনয় করা কালীন তা আমি দেখেছি।

আমার মতে নাটক দেখার ক্লান্তিকর অধ্যায় হচ্ছে অনবরত পর্দা পড়া। তাই পর্দাকে এড়িয়েছি। যাঁরা তা পারবেন না তাঁরা অনিল যেখানে বলছে, 'এ গ্রেট এ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড আর্টিষ্ট, যাকগে ও সব কথা, তুমি বুঝবে না, চলো', সেইখানে একবার, আর একবার সুনীল যেখানে বলছে 'ভগবান, আমার চোখ দুটো কেড়ে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখলে কেন, কেন কেন' সেইখানে একবার পর্দা ফেলতে পারেন।

অতীতে নাটকটির অভিনয়-সাফল্যের কথা কিছু বললে হয়তো অন্যায় হবে না। বরাহনগরের বিশিষ্ট নাট্যপ্রতিষ্ঠান 'অভ্যুদয়'-এর জন্যে এই নাটকটি লিখি। তাঁরা বারবার নাটকটির সফল-অভিনয় তো করেছিলেনই, তা ছাড়া ১৯৫৬ সালের থিয়েটার সেণ্টারের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় এই নাটকটিই সংক্ষেপ করে 'আয়না' নামে অভিনয় করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এই সুযোগে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সব শেষে আমার কৃতজ্ঞতা শ্রীপবিত্র কুমার দাসের কাছে যাঁর একান্ত আগ্রহে এই নাটকটি ছাপানো সম্ভব হয়েছে।

৯৮, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
কলিকাতা-৩৫

কিরণ মৈত্র

প্রকাশকের বক্তব্য

প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত এ নাটকখানিকে তাঁর ভূমিকা সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য তাঁর প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সমালোচনা গঠনমূলক এবং গুণ-বিচার নিরপেক্ষ, প্রতিভাকে তিনি ঠিক জায়গায় উৎসাহিত করেছেন অথচ তাঁর অসম্পূর্ণতার প্রতিও কল্যাণকামী শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি তুলে ধরেছেন। আপাত-বিরুদ্ধ সমালোচনার ভিতর দিয়েও তাঁর প্রশংসাই আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রকাশনার তরফ থেকে আমরা যে দৃষ্টিকোণ হতে এ নাটকটিকে বিচার করেছি, তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। বারো ঘণ্টার ভিতর নাটকের চরিত্রগুলির কোন মানসিক বিবর্তন আমরা আশা করিনি, বরং তা করলে বাস্তবতা খণ্ডিত হ'ত বলে মনে করেছি। অর্ধদিনের ভিতর ঘটনার আবর্ত পূর্ণ এক পাক ঘুরে আসতে পারে, কিন্তু মানুষকে বদলাতে হলে পরিপার্শ্বের সংঘাতের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় প্রয়োজন। নাটকের আরম্ভে ও অনুবন্ধে চরিত্রগুলি নিজেদের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় রেখেছে এবং কেউ বিকৃত বা বিকারগ্রস্ত হয়নি এবং নাট্যকারও তা চাননি বলেই মনে করেছি। একাঙ্কিকার সময়-সংক্ষেপের তাগিদ তো অনস্বীকার্য, কিন্তু ওরই ভিতর একটা জায়গায় climax টেনে আনা দোষাবহ মনে করিনি; climax-এ উত্তেজনা সৃষ্টি স্বাভাবিক, এবং নাটকেরও তা অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু এক্ষেত্রে তা কৃত্রিম হয়েছে বলে ভাবিনি।

কিন্তু আমাদের সাহিত্য-বিচারই শেষ নয়, তারও আবার বিচার হবে রসজ্ঞ পাঠকদের কাছে। তাঁদের কাছে যদি এ নাটকখানি সমাদর লাভ করে তবেই এ প্রকাশনা সার্থক হবে এবং আমরা কৃতজ্ঞ হব।

বারো ঘণ্টা

[নেপথ্যে সাতটা বাজার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, মাণিক পড়ছে। রাজেশ্বরের চীৎকার—নিয়ে গেল···চুরি করে নিয়ে গেল! ধীরে ধীরে পট উঠল। সাধারণ মধ্যবিত্তের একখানা ঘর। দুদিকে দরজা, মাঝখানে জানালা। এককোণে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। একটা বই রাখবার শেল্‌ফ। কিছু বই তাতে। অপর কোণে ছোট একটা তক্তপোষ—তাতে বিছানা মোড়ানো রয়েছে, সতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা ক্যালেণ্ডার, ছবি কয়েকটা। বাইরে থেকে রাজেশ্বর একজন পোস্টারম্যানের হাত ধরে টানতে টানতে স্টেজে প্রবেশ করল।]

রাজেশ্বর। মই লাগিয়ে ছাদে উঠছিলি চুরি করবি বলে, না?

পোস্টারম্যান। [ভীতভাবে] না। আমি···আমি পোস্টারম্যান। পোস্টার মারব বলে—

রাজেশ্বর। পোস্টার! কিসের পোস্টার?

পোস্টারম্যান। থিয়েটারের। [চলে যেতে উদ্যত হল]

রাজেশ্বর। পালাচ্ছিস যে! হাতে ওটা কি?

পোস্টারম্যান। পোস্টার। এই পোস্টারটাই তো আপনাদের বাড়ির দেওয়ালে···

রাজেশ্বর। পড়তে জানিস?

পোস্টারম্যান। [ভীতভাবে] হ্যাঁ।

রাজেশ্বর। পড় কি লিখেছে?

[পোস্টারম্যান ভয়ে ভয়ে বর্তমান নাটকের লেখক, পরিচালক ও ভূমিকালিপি পড়ে যেতে লাগল]

রাজেশ্বর। যা, বেশ হয়েছে! [পোস্টারম্যান যেতে উদ্যত হল] এই শোন। চাকরি করিস তো! খুব সাবধানে কাজ করবি, নয়তো চাকরি যাবে। তখন বৌ ছেলে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছিস? যা! [পোস্টারম্যান পালিয়ে বাঁচল]···পালাল··· পালাল···চুরি করে পালাল···ধর ধর ওকে!

[রাজেশ্বর ভেতরে চলে গেল। বাইরে থেকে অমিয় তার এক সুপুরুষ বন্ধু সমরকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল]

অমিয়। একটু দাঁড়াও। বাজারটা রেখে আসি।

[অমিয় ভেতরে চলে গেল]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] পালাল! পালাল! চুরি করে পালাল!

[সমর বিস্মিতভাবে তা শুনতে লাগল। অমিয় ফিরে এল]

সমর। কি ব্যাপার বল তো?

অমিয়। উনি আমার বাবা, সমর। অফিসে কি একটা ব্যাপারে বাবার চাকরি যায়। চাকরি যাবার পর থেকেই বাবা যেন কেমন হয়ে যান। আমার মা-ই জামা সেলাই করে, ঠোঙা তৈরী করে আমাদের মানুষ করে তোলেন। আমি তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছি। মা হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর থেকেই বাবার মাথার গোলমাল হয়েছে। দাঁড়িয়ে কেন? বসো। সন্ধ্যাকে এক কাপ চা করতে বলি। কতদিন পরে দেখা।

সমর। না, না। চায়ের দরকার নেই। তুমি বসো।

অমিয়। তা কি হয়। [চীৎকার করে] সন্ধ্যা, এক কাপ চা নিয়ে আয় তো!

সন্ধ্যা। [নেপথ্যে] যাই দাদা!

সমর। সত্যি কতদিন পরে দেখা, না?

অমিয়। অনেক দিন।

সমর। সেই ম্যাট্রিক পাশের পর আজ প্রথম দেখা হল।

অমিয়। তারপব কী করছ এখন?

সমর। ব্যবসা করছি।

অমিয়। কেমন চলছে?

সমর। ভালোই।

অমিয়। বিয়ে করেছ?

[নেপথ্যে অমিয়র রুগ্ন শয্যাশায়ী স্ত্রী রাধার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

রাধা। [ভেতর থেকে] ওগো শুনছ?

অমিয়। [সমর জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতে] আমার স্ত্রী রাধা। ছ'মাস ধরে শয্যাশায়ী।

সমর। ছ'মাস ধরে? কী অসুখ?

অমিয়। হার্টের ট্রাব্‌ল্‌, এ্যানিমিয়া—কী নয়!

সমর। ভালো ডাক্তার দেখাচ্ছ তো?

অমিয়। ইচ্ছে তো হয় দেখাই। কিন্তু সামর্থ কোথায় বল? দেড়শ টাকা মাইনের কেরাণী। বাবা, তিন ভাই, বোন, বৌ, তার

ওপর ছেলে! বাড়িভাড়া দিতে হয় চল্লিশ টাকা, সংসার চালাতেই প্রাণান্ত! ডাক্তার দেখাই কেমন করে?

সমর। তুমি তো খুবই কষ্টে আছ দেখছি!

অমিয়। কষ্ট? হ্যাঁ, তা একটু কষ্ট হচ্ছে বই কি! কিন্তু আমি জানি সমর। একদিন আসবেই যে দিন আমি—

[সুনীল ঢুকল। অমিয়র খুড়তুত ভাই। বয়স ২৯-৩০, চোখে দেখতে পায় না। শীর্ণ চেহারা। বিমর্ষতা চোখেমুখে]

সুনীল। নিখিল। নিখিল আছিস?

অমিয়। না নেই। কেন? নিখিলকে কী দরকার?

সুনীল। ও যে কাল আমাকে বলেছিল একটা কবিতা পড়ে শোনাবে।

অমিয়। সকালে তো দেখলাম কোথায় যেন গেল। এখুনি আসবে হয় তো।

সুনীল। আচ্ছা। [সুনীল ভেতরে গেল]

অমিয়। আমার খুড়তুত ভাই সুনীল। ওর জন্মের কিছুদিন পরেই কাকা কাকীমা হঠাৎ মারা যান। কাকা বিদেশে চাকরি করতেন। আর কেউ না থাকায় বাবা ওকে আমাদের এখানে নিয়ে এসে আর সব ভায়েদের মতই মানুষ করতে থাকেন। বুঝলে সমর। ছোটবেলায় সুনীল অসম্ভব মেধাবী ছিল। প্রতি বছর ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাসে উঠত। থার্ড ক্লাসে পড়বার সময় হঠাৎ টাইফয়েড হল। ওর বাঁচবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। বেঁচে অবশ্য ও উঠল। কিন্তু তার চরম মূল্য ওকে দিতে হল। চোখ দুটো ও হারাল। সুনীলের যদি···

[ছোটভাই নিখিল ঢুকল। বয়স ২০-২১, শান্ত, সুন্দর চেহারা]

অমিয়। [সমরকে] এই আমার ছোট ভাই নিখিল। এবারে বি. এ. দিয়েছে। আজই রেজাল্ট বেরোবে।

সমর। পাশ করবে তো?

অমিয়। পাশ করবে মানে? নিশ্চয়ই করবে। শুধু তাই নয় সমর। আমি একেবারে নিশ্চিত জানি, ও ডিসটিঙ্কশনে পাশ করবে।

সমর। [প্রশংসার সুরে] তাই নাকি?

নিখিল। না, না। বড়দা আমার সম্বন্ধে সব সময়েই বাড়িয়ে ভাবেন। বড়দা, একটা টিউশনি পাচ্ছি। করব?

অমিয়। না, না, ও-সব টিউশনি করতে হবে না। এগজামিনের সময় দিন নেই, রাত নেই পড়েছিস, এখন একটু বিশ্রাম কর।

নিখিল। কিন্তু আমি বলি কি বড়দা, একদম বসে না থেকে তবু তো দশ টাকা—

অমিয়। খুব হয়েছে। আর দশ টাকায় কাজ নেই। যা।

[নিখিল চলে গেল]

দেখলে তো, আরে বাবা দুদিন বাদে সেই ঘানি তো ঘোরাতেই হবে! ক'টা দিন জিরিয়ে নাও না।

[সন্ধ্যা চা নিয়ে ঢুকল। বয়স ২৩-২৪-এর কাছাকাছি। সুশ্রী]

আমার বোন সন্ধ্যা। আর ইনি হলেন আমার বন্ধু সমর।

[নমস্কার বিনিময়]

রাধা। [ভেতর থেকে] ওগো শুনছো, একবার শুনে যাও না। আঃ!

অমিয়। সমর! তুমি একটু সন্ধ্যার সঙ্গে গল্প কর। আমি এক্ষুনি ভেতর থেকে আসছি। [প্রস্থান]

সমর। অমিয় শুধু শুধু আমার জন্যে তোমাকে কষ্ট দিল।

সন্ধ্যা। না, না, কষ্ট আর কি!

সমর। [হেসে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে, খেতে খেতে] অমিয় আমার স্কুলের বন্ধু। ক্লাসে ওর সঙ্গেই আমার ভাব ছিল বেশী। ম্যাট্রিক পাশের পর আমি কলেজে ভর্তি হলাম। ও হল না। সেই যে ছাড়াছাড়ি হল আর দেখা হয়নি। আজ হঠাৎ বাজারে ওর সঙ্গে দেখা।

সন্ধ্যা। আপনাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না।

সমর। বারে, মনে করব কেন, বল না। [চায়ের কাপ নামিয়ে] সত্যি চা-টা বেশ হয়েছে। বল এবার কি বলবে।

সন্ধ্যা। না থাক।

সমর। আরে বলই না। আমার কাছে তোমার লজ্জা কি!

সন্ধ্যা। আমাকে একটা চাকরি দেখে দিতে পারেন? যে-কোন একটা চাকরি! ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু ভাগ্যে পাশ করা আর হয়ে ওঠেনি।

সমর। চাকরি! তুমি চাকরি করবে?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ। কথাটা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন? কিন্তু আশ্চর্য হবার কি আছে বলুন। আজকের দিনে অনেক মেয়েই তো চাকরি করছে। আমিও করব।

সমর। কিন্তু···

সন্ধ্যা। এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই সমরবাবু। মেয়েরা যখন মুখ ফুটে একজন প্রায় অপরিচিতের কাছে চাকরির কথা বলে তখন চাকরি যে তার কতটা দরকার তা আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন। আমার অনুরোধ, যদি পারেন, আমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করবেন। [শেষের দিকে সন্ধ্যার গলা ভারী হয়ে উঠল। সে দ্রুত প্রস্থান করল।]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] নিয়ে গেল ! নিয়ে গেল ! চুরি করে নিয়ে গেল……

[অমিয় ঢুকল]

অমিয়। কি, চা খাওয়া হয়ে গেল ? সন্ধ্যা চা দিলই বা কখন আর খেলেই বা কখন !

সমর। শুধু তাই নয়। চা দেওয়া আর খাওয়ার মধ্যে রীতিমত আলাপও হয়ে গেল।

অমিয়। তাই নাকি ? বেশ। তা দুপুরবেলা না হয় নিমন্ত্রণ রইল। ওর হাতে খেয়ে যেও।

সমর। না, না।

অমিয়। আরে না কেন ! গরীবের বাড়িতে দুটি খুদ-কুঁড়ো না হয় খেয়েই গেলে !

সমর। তুমি তো অফিস যাবে ?

অমিয়। তাতে কি হয়েছে ? আমি না থাকলেই বা। সন্ধ্যাই তোমাকে আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়াবে।

সমর। সত্যি তোমার বোনকে বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়।

অমিয়। ওর জন্মে একটা পাত্র দেখে দাও না। টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ওর রূপ আর গুণ দেখে—

সমর। কিন্তু ও বলছিল যাতে ওর একটা চাকরি—[অমিয় কঠিন হয়ে গেল, সমর তা লক্ষ্য করে] তা চাকরি করা তো খারাপ কিছু নয়।

অমিয়। কিন্তু সন্ধ্যাকে আমি চাকরি করতে দিতে রাজী নই সমর। আমি থাকতে, অনিল নিখিল থাকতে, সন্ধ্যা চাকরি করবে এটা আমি চাই না।

সমর। কিন্তু আজকাল তো অনেক মেয়েই—

অমিয়। হ্যাঁ করছে। কিন্তু তাদের রোজগার করবার মত তিন তিনটে ভাই নেই সমর। না, না, ও চাকরি করে তা আমি চাই না। তার চাইতে তুমি ওর একটা পাত্র দেখে দাও।

[ভেতর থেকে রাধার কণ্ঠস্বর]—

রাধা। [ভেতর থেকে] শুনছ, একবার এদিকে এস তো! বুকের ভেতরটা কেমন করছে।

অমিয়। রাধা। আবার কি জানি কেন ডাকছে। তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি আসছি।

[ভেতরে চলে গেল, বাইরে থেকে অনিল ঢুকল। বয়স ২৭-২৮]

অনিল। [গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকে হঠাৎ সমরকে দেখে] আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

সমর। চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। আজ আমি প্রথম এ-বাড়িতে আসছি। অমিয় আমার বন্ধু।

অনিল। তাই নাকি? তা বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সমর। তোমার বড়দার সঙ্গেই তো এলাম।

অনিল। ওঃ, আমি কে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? আমি আমার দাদার পরের ভাই। নাম অনিল। পেশা বেকারী।

সমর। [কথা বলার ধরণে হেসে] বেকার কেন?

অনিল। চাকরি পাওয়া যায় না বলে।

সমর। চেষ্টা করছ?

অনিল। চেষ্টা মানে? প্রায় দশটা জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা টাকা আছে? ধার দিতে পারেন?

সমর। আছে। কী করবে?

অনিল। সিনেমা দেখব। মেট্রোয় রিটা-র একখানা বই এসেছে। বইটা নাকি হিট্ পিকচার হয়েছে। এ্যাড্‌ভান্স বুক করে রাখি।

[সমর টাকা দিল]

অনিল। মেনি থ্যাঙ্কস্। [প্রস্থানোদ্যত হয়ে দাঁড়াল] হ্যাঁ, দেখুন, আমি যে ছেলেটা ভালো নই এ কথাটা বড়দাকে বলবেন না। বড়দা মনে দুঃখু পেতে পারেন। [একটু এগিয়ে] আচ্ছা ইচ্ছে হয় বলবেন, বড়দা জানেন—এই ভাইটা তাঁর ভালো নয়। আচ্ছা চলি [একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে] বাই-দি-বাই, আপনার নাম—

সমর। সমর রায়।

অনিল। সমরদা আপনি বিয়ে করেছেন?

সমর। কেন বল তো!

অনিল। মনে হচ্ছে আপনি ভালো লোক। আমার বোন সন্ধ্যাকে আপনি বিয়ে করতে পারেন না?

সমর। তোমরা সবাই বুঝি সন্ধ্যার বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

অনিল। না। আমি তা হইনি। কারণ আমি জানি সন্ধ্যার বিয়ে হবে না। আপনার ওপর একটা চান্স নিলাম।

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি আমাকে এক গ্লাস জল দিয়ে যাও তো!

সন্ধ্যা। [নেপথ্যে] যাই বৌদি।

[অনিল প্রস্থান করল। সমর একটা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে পড়তে লাগল। রাজেশ্বর দ্রুত ঘরে ঢুকল]

রাজেশ্বর। ধর, ধর, ওকে। পালাল! পালাল! চুরি করে পালাল! [ছুটে এসে সমরকে ধরল। সমর পেছন ফিরতেই] হু আর ইউ?

সমর। [অল্প ভীত স্বরে] আমি···আমি অমিয়র বন্ধু।

রাজেশ্বর। বন্ধু! [জোরে হেসে উঠে] আর ইউ এ পুয়োর চ্যাপ্?

সমর। না, মানে ঠিক—

রাজেশ্বর। নও! তাহলে তুমি আমাদের বাড়ি আস কেন?

সমর। না। আমি তো আসিনি। আজই প্রথম আসছি!

রাজেশ্বর। তাতে কি হয়েছে? আজ প্রথমবার আসছো। কাল দ্বিতীয়বার আসবে। তারপর রোজ আসবে। আই নো, তুমি রোজ আসবে।

সমর। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।

রাজেশ্বর। না, না, আমি ভুল বুঝিনি। ডোন্ট ফরগেট, আমারও একদিন যৌবন ছিল।

সমর আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না

রাজেশ্বর। বোঝা উচিত ছিল ইউ আর এজেড্ এনাফ্

সমর। কিন্তু—

রাজেশ্বর। নট্ এ ওয়ার্ড মোর। গেট্ আউট্। ভবিষ্যতে এ বাড়িতে তুমি ঢুকবে না।

সমর। আচ্ছা। [প্রস্থানোদ্যত]

রাজেশ্বর। শোন মাই বয়, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। এ পরিবারের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িও না। ইউ উইল বি রুইন্ড্। ইউ উইল বি রুইন্ড্।

[ভেতরে চলে গেল, সমরও প্রস্থানোদ্যত হতে অমিয় ঢুকল]

অমিয়। কি হল সমর, চলে যাচ্ছ যে!

সমর। তোমার বাবা—

অমিয়। বাবার কথায় তুমি কিছু মনে করো না। বাবার মাথার ঠিক নেই—

সমর। না, না, আমি কিছু মনে করিনি। আচ্ছা তাহলে আমি চলি।

অমিয়। দুপুরে নিশ্চয়ই আসছো?

সমর। কিন্তু—

অমিয়। না, না, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। দুপুরে এসে তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।

সমর। বেশ আসব।

[সমর চলে গেল, সন্ধ্যা ঢুকল]

অমিয়। সন্ধ্যা, তুই নাকি সমরকে চাকরির কথা বলেছিস?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ।

অমিয়। কিন্তু তুই চাকরি করিস এটা আমি চাই না।

সন্ধ্যা। কেন? আজকাল তো অনেক মেয়েই চাকরি করছে। আমি চাকরি করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

অমিয়। হ্যাঁ হবে। বাবা যদি বুঝতে পারেন তুই চাকরি করতে যাচ্ছিস তা হলে—

সন্ধ্যা। তা হলে কি হবে? বাবাব পাগলামিটা একটু বাড়বে। এই তো। কিন্তু তার বদলে বাড়িব এতগুলো লোক একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। বড়দা···তুমি অমত করো না। সমরবাবু যদি একটা চাকরি করে দেন তা হলে···

অমিয়। [দৃঢ়স্বরে] না। তা হয় না। বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তোকে চাকরি করতে দিতে পারি না।

সন্ধ্যা। তাহলে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে কেন? তুমি একা মুখ দিয়ে রক্ত তুলে এই বিরাট সংসার টানবে আর আমরা বসে বসে খাব, না?

[সন্ধ্যা উদ্গত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অমিয় এগিয়ে এসে সন্ধ্যার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে—]

অমিয়। কতদিনই বা আর খাটতে হবে। নিখিলের আজ পাশের খবর বেরোবে। পাশ ও নিশ্চয়ই করবে। অফিসের সাহেবকে ধরে-করে ওর একটা চাকরি করে দেব। তারপর দেখেশুনে তোর একটা বিয়ে দিয়ে দেব। শুধু শুধু ক'টা দিনের জন্যে খেটে শরীর খারাপ করবি?

সন্ধ্যা। নিখিল পাশ করতে পারবে বলে তুমি মনে করো দাদা!

অমিয়। নিশ্চয়ই পাশ করবে। ডিস্‌টিঙ্কশনে পাশ করবে দেখে নিস। [প্রায় আপন মনে] ছোটবেলায় আমার সাধ ছিল বি. এ. পাশ করব। কিন্তু হল না। ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকরিতে ঢুকতে হল। আমার জীবনে আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। দেখি নিখিলটা যদি কিছু করতে পারে। [যেতে যেতে] হ্যাঁ শোন, সমরকে বলেছি এখানে দুপুরে খেতে। ও আসবে। দেখিস ওর যেন কোন অসুবিধে না হয়। হ্যাঁ বিকেলেও একবার আসতে বলিস। যাই—ন'টা বাজে। অফিসে বেরোবার সময় হল। স্নান করতে হবে—

[অমিয় চলে যেতেই সুনীল ঢুকল]

সুনীল। নিখিল!

সন্ধ্যা। কি চাই মেজদা?

াল। সন্ধ্যা! নিখিল আসেনি?

সন্ধ্যা। এসেছে তো।

সুনীল। কোথায় গেল ও?

সন্ধ্যা। কেন, কী দরকার?

। ও যে বলেছিল একটা কবিতা শোনাবে!

সন্ধ্যা। বেশ তো, বসোই না। আমিই শোনাচ্ছি [হাত ধরে বসাল] কার কী কবিতা বলো তো?

সুনীল। তা তো জানি না।

সন্ধ্যা। তা হলে?

সুনীল। যে কোন একটা কবিতা শোনা না।

[সন্ধ্যা একটা কবিতার বই এনে খুঁজতে লাগল]

সন্ধ্যা। শোন।

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে,
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে।

সুনীল। [থামিয়ে] হ্যাঁ রে, দাদা বড় রোগা হয়ে গেছে, না?

সন্ধ্যা। কে বলল তোমাকে এ কথা, বড়দার শরীর তো বেশ ভালোই আছে। তারপর শোন—

প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে,
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।

সুনীল। সংসারে অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে, না?

সন্ধ্যা। না তো, তারপর শুনবে? না, ওই সব বাজে কথা ভাববে?

সুনীল। আচ্ছা পড়।

সন্ধ্যা। [পড়তে লাগল]

ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

সুনীল। আলো—পৃথিবী আলোয় আলো—আর আমার সব অন্ধকার —এমনি করে বেঁচে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

[চোখে জল ভরে আসে]

সন্ধ্যা। মেজদা, তুমি আবার কাঁদছ ?

সুনীল। কাঁদতে তো আমি চাই না···তবু কেন যে বারবার চোখটা জলে ভরে আসে! চোখে আলো নেই। তবু এত জল কোত্থেকে আসে বলতে পারিস ? এত জল···এত জল···

[সুনীল চলে যেতেই অনিল ঢুকল]

অনিল। সন্ধ্যা! এই নে, এই ক'টা কমলালেবু রাখ। দু'টো নিজে খাস। আর বাকী ক'টা বৌদিকে দিস।

সন্ধ্যা। আমাকে খেতে বলছ, ব্যাপার কি বল তো ছোড়দা ?

অনিল। তোর শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটু নজর দেওয়া দরকার।

সন্ধ্যা। শরীর তো তোমারও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিজে শরীরের ওপর একটু নজর দিলেও তো পার।

অনিল। আরে বাবা, আমার শরীরের চাইতে তোর শরীরের ওপর নজর দেওয়া বেশী দরকার! বুঝলি না, কখন যে বিয়ের ফুল ফট্ করে ফুটে যায়! কে জানে ?

সন্ধ্যা। দেখ ছোড়দা, সব সময়ে ইয়ার্কি ভালো লাগে না!

অনিল। ইয়ার্কি হল। আচ্ছা সমরদা যখন মাথায় টোপর দিয়ে—

সন্ধ্যা। [কঠিন স্বরে] তুমি বুঝি সমরবাবুকে ঐ সব কথা বলতে গেলে···

অনিল। হ্যাঁ তো, স্রেফ জিগ্যেস করলাম আপনি আমার বোনকে বিয়ে করবেন ?

সন্ধ্যা। [রাগত ভাবে চীৎকার করে] তুমি কী ছোড়দা ! তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই…তুমি কী……

[রেগে ভেতরে চলে গেল]

অনিল। যা বাবা, অন্যায়টা যে কি করলাম তা তো বুঝলাম না।

[মাণিক ঢুকল। অমিয়র ছেলে, বয়স ৭-৮]

মাণিক। কাকা।

অনিল। কি বলছিস মাণকে ?

মাণিক। মা-র অসুখটা সারছে না কেন ?

অনিল। ভালো ডাক্তার দেখান হয় না বলে।

মাণিক। ভালো ডাক্তার দেখাও না কেন ?

অনিল। থাম, যত ডেঁপো ছেলের কথা। যা !

[মাণিক প্রস্থানোদ্যত]

এই শোন। কেন ভালো ডাক্তার দেখান হয় না, জানিস ? আমর' গরীব বলে।

মাণিক। আমরা গরীব কেন কাকা ?

অনিল। জানি না যা। পড়গে যা।…ন'টা বাজতে না বাজতেই বই-পত্তর শিকেয় তুলে এসেছেন। যা !

[মাণিক চলে গেল]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] কেউ না…কেউ বাঁচবে না। কেউ না।

দ্বারিক। [নেপথ্যে] অমিয় বাবাজী। আছো নাকি ?

অনিল। এই যে আসুন। ভেতরে আসুন।

[দ্বারিকবাবু ঢুকলেন। বয়স ৫২-৫৩। মোটা-সোটা চেহারা। দেখলে বেশ সহজ ও সরল প্রকৃতির বলে মনে হয়]

দ্বারিক। এই যে অনিল বাবাজী। দাদা কোথায় ?

অনিল। দাদা বোধ হয় বৌদির কাছে বসে আছেন।

দ্বারিক। বসে ? তা বৌমার অসুখটা খুব বেড়েছে বুঝি ?

অনিল। হ্যাঁ তা একটু বেড়েছে।

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি ! জলের গেলাসটা দাও তো।

সন্ধ্যা। [নেপথ্যে] দিই বৌদি। এই দেখ বৌদি, মেজ ঠাকুরপো তোমার জন্যে কমলালেবু এনেছে ?

দ্বারিক। হ্যাঁ ভালো চিকিৎসা করাও। ঐ ধর না আমার মেয়ে মায়ার কথা ! গেল বছরে আষাঢ় মাসের শেষাশেষি অসুখে পড়ল। বড় ডাক্তার আনলাম। দহরম মহরম চিকিৎসা করলাম। মেয়েটা সেরে উঠল। কিন্তু তার দরুন যে দেনাটা হল তা আজও শোধ করতে পারলাম না। তাই একবার তোমার দাদার কাছে এলাম। যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায়।

অনিল। আচ্ছা দ্বারিকবাবু, একটা কথা বলব। আপনার মেয়ের বিয়ে হবার কোন আশাই নেই, না ?

দ্বারিক। এ্যাঁ…তা…হেঁ…হেঁ…তা কথাটা একেবারে মিথ্যে বলনি বাবাজী। বামুনের ঘরের মেয়ে। এক বিয়েতেই পাঁচ সাত হাজার বেরিয়ে যায়। তা যাক। তা তোমার হাতে পাত্তর-টাত্তর আছে নাকি ?

অনিল। হ্যাঁ আছে।

দ্বারিক। [আগ্রহের সঙ্গে] তাই নাকি? পাত্তর কী করে? কোথায় থাকে? চায় কেমন?

অনিল। পাত্রটি হচ্ছি আমি।

দ্বারিক। [নিরুৎসাহের সুরে] ওঃ তুমি।

অনিল। হ্যাঁ আমি। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। দিন না। পণ-টন কিছু লাগবে না। খালি যত টাকা ভাড়া বাকী আছে, তা ছেড়ে দিতে হবে। আর যতদিন না আমার অবস্থা ফেরে ততদিন ভাড়া চাইতে পারবেন না।

দ্বারিক। হেঁ-হেঁ···কি যে বল বাবাজী। তুমি এখনও ছেলেমানুষ। এর মধ্যে বিয়ে করবে কি?···আচ্ছা বাবাজী···তা হলে এখন চলি। একটু পরে আবার আসব'খন। রুগী মানুষের পাশে বসে আছে তাকে আর বিরক্ত না করাই ভালো। [প্রস্থানোদ্যত]

অনিল। চলে যাচ্ছেন যে, কথার জবাব দিয়ে যান।

দ্বারিক। বাবাজী! রোজগার-পাতির ব্যবস্থা কর, তারপর না হয়···তাছাড়া ঘরে অতবড় বোন তার বিয়ের ব্যবস্থা—

অনিল। সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আর দেখুন, রোজগার আজ না হয় কাল করব। চিরকাল তো আর কিছু বসে থাকব না। যতদিন বসে আছি ততদিন না হয় মায়া আপনার কাছেই থাকবে; তারপর যখন রোজগার করব তখন না হয়—

দ্বারিক। কিন্তু বাবাজী, আজকের দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মানে ঘাড়ের বোঝা নামানো। তা বিয়ে দিয়ে যদি ঘাড়ের বোঝা ঘাড়েই থেকে যায় তা হলে বিয়ে দেবার দরকারটা কি বল?

অনিল। ওঃ তা হলে রাজা নন?

দ্বারিক। হ্যাঁ কি করে বলি বল?

অনিল। বেশ দেবেন না। কিন্তু শুনে রাখুন ছ'মাসের মধ্যে আমি মান্থলি দশহাজার কামাব। তখন যেন আঙ্গুল কামড়াবেন না। যান।

দ্বারিক। তা বাবাজী, যাব বলেই তো এসেছি। কিন্তু কি জান বাবাজী? ও রাধাও নেচেছে আর দশমণ তেলও পুড়েছে।

[দ্বারিকবাবু চলে যেতে নিখিল ঢুকল]

অনিল। কি চাই রে?

নিখিল। বইগুলো রাখতে এলাম।

অনিল। এই, আজ তোর রেজাল্ট বেরোবে না? পাশ করতে পারবি তো?

নিখিল। কি করে বলব?

অনিল। কি করে বলবি মানে? তুই এগজামিন দিয়ে এলি, আর তুই বলতে পারবি না, পাশ করতে পারবি কি না? না, তুই দেখছি ফেলই করবি।

[নিখিলের হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেল]

নিখিল। দাদা।

অনিল। এ্যাঁ···ওঃ না রে না। তুই নিশ্চয়ই পাশ করবি।

নিখিল। [কম্পিত স্বরে] না দাদা তুমি মিথ্যে বলোনি। হয়ত পাশ না-ও করতে পারি।

অনিল। সে কি রে ?

নিখিল। হ্যাঁ। যদি পাশ করতে না পারি তা হলে···তা হলে বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব··· [নিখিল ভেতরে চলে গেল]

[জনৈক হিন্দুস্থানী গোয়ালার প্রবেশ]

গোয়ালা। এই যে দাদাবাবু! একবার বড়দাদাবাবুকে ডেকে দিন তো!

অনিল। কেন ?

গোয়ালা। হামার দুধের দামটা হেখনও পাইলাম না। আজ দু'মাস হলো। দুধভি বন্ধ কইরে দিলো। টাকাভি পাইলাম না। দেশে ঘরওয়ালীর বহুৎ বিমার। ঘরকে যাব। দামটা আজ পাইলে ভালা হোয়ে।

অনিল। ক'টাকা পাওনা ?

গোয়ালা। বিশ পাঁচ হোবে বাবু।

অনিল। পাঁচিশ টাকা ? আচ্ছা দাঁড়া। [ঘরের ভেতরে চলে গেল, একটু পরে একটা সোনার মেডেল নিয়ে ঢুকল] এই নে।

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি ভাত নেমেছে ? ওঁর আবার অফিসের সময় হয়ে গেল।

সন্ধ্যা। [নেপথ্যে] হ্যাঁ বৌদি।

গোয়ালা। এ হামি নিয়ে কি করবো বাবু!

অনিল। নিয়ে যা না। সোনার মেডেল। বিক্রী করলে ত্রিশ টাকার ওপর দাম হবে।

গোয়ালা। আচ্ছা বাবু। বলছো যখন দাও। [মেডেলটা নিয়ে, একটু এগিয়ে আবার ঘুরে এসে] হ্যাঁ! লাল পাগড়ী আবার ধরবে না তো বাবু?

অনিল। আরে না। কাল থেকে আবার এক পো করে দুধ দিয়ে যাবি।

গোয়ালা। আচ্ছা বাবু।

অনিল। শোন, দুধে কিন্তু একদম জল মেশাবি না।

গোয়ালা। [কানে হাত দিয়ে] হায় রাম! এ কি করে হবে বাবু। দুধে একটু জোল না দিলে যে পাপ হোয়ে।

অনিল। [হেসে] পাপ হয়! আচ্ছা সিকি ভাগ জল মেশাবি। তার বেশী মেশাবে তো একবার দেখে নেব। বৌদির জন্যে দুধ নিচ্ছি। [গোয়ালা চলে গেল]

সন্ধ্যা! সন্ধ্যা!

[সন্ধ্যা ঢুকল]

না, তোদের দেখছি আক্কেল বলে কোন জিনিস নেই।

সন্ধ্যা। কেন? আমি আবার কি করলাম?

অনিল। দাদা বৌদির দুধ বন্ধ করে দিয়েছিল। তা তুই জানতিস?

সন্ধ্যা। জানতুম।

অনিল। বারণ করিসনি কেন?

সন্ধ্যা। দাদা তো বন্ধ করেনি। বৌদিই বন্ধ করিয়েছে।

অনিল। দাদাই করুক আর বৌদিই করুক। আমি আবার আজ থেকে দুধ বলে দিলাম।

সন্ধ্যা। বললেই দুধ দিচ্ছে কিনা! পঁচিশ টাকা পায় গয়লা!

অনিল। সে টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।

সন্ধ্যা। সে কি?

অনিল। হ্যাঁ রে। সেই যে ফুটবল খেলে সোনার মেডেলটা পেয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যা। [বিস্মিত ও ব্যথিত স্বরে] তুমি তোমার ঐ সোনার মেডেলটা দিয়ে দিলে? বল কি ছোড়দা! রোজ একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না দেখলে যে তোমার ঘুমই হয় না।

অনিল। না হোক······বেকারদের অত ঘুম ভালো নয়···অত ঘুম ভালো নয়। [অনিল বাইরে চলে গেল]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] কেউ বাঁচবে না······কেউ না···পালাল··· চুরি করে পালাল!

[অলক ও তার বোন মায়া ঢুকল। অলক ৩১-৩২ বছরের আর বোন মায়া ২১-২২ বছরের। অলকের গায়ে হাওয়াই সার্ট। পরণে প্যাণ্ট, পায়ে চটি জুতো। হাতে ব্যাগ। মায়ার সাধারণ পোষাক]

মায়া। সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। কে? আরে, মায়া যে! অলকবাবুকেও সঙ্গে দেখছি। বসুন। [অলক বসল, মায়ার প্রতি] কেমন আছিস?

মায়া। ভালো। তুমি কেমন?

অলক। [কি একটা খাতার পাতা উল্টোতে উল্টোতে] আচ্ছা সন্ধ্যা দেবী! আপনার কি মত বলুন তো! বিজনেসের মধ্যে কাঠের ব্যবসা করা না মাছের ব্যবসা করা, কোন্‌টা বেশী লাভজনক?

সন্ধ্যা। সে সম্বন্ধে আমার কোন আইডিয়াই নেই।

অলক। [উঠে] আপনার যদি আইডিয়া না থাকে তা হলে কার আইডিয়া থাকবে বলুন। আমার কথা যদি ধরেন আমি কিন্তু কাঠের বিজনেসটাকেই বেশী প্রেফার করি, কেননা কাঠ সহজে পচে না। অথচ মাছ যে-কোন মুহূর্তেই পচে যেতে পারে। জাল ফেললেই যে মাছ ধরা পড়বে তার কোন গ্যারান্টিও নেই! কিন্তু কুড়ুল চালালেই গাছ কাটা পড়বে।

মায়া। আঃ, দাদা তুমি থামবে?

অলক। থামব কেন? আমি সন্ধ্যা দেবীর কাছে একটা ভ্যালুয়েব্‌ল্‌ সাজেস্‌শান নিচ্ছি।

সন্ধ্যা। আপনি বুঝি বিজনেস করবেনই?

অলক। ও ইয়েস, যদি কিছু করি, বিজনেসই করব!

মায়া। তুমি তো আজ পাঁচ বছর ধরে বিজনেস করব করবই করছ। অথচ আজ পর্যন্ত—

অলক। সে দোষ আমার নয়। বাবার! বাবাকে তো বারবার বলেছি—বুঝেছেন সন্ধ্যা দেবী, বারবার বলেছি—এই বাড়িটা বিক্রী করে দিয়ে আমাকে হাজার ত্রিশেক টাকা দাও। দু'বছরের মধ্যে লাখ টাকায় দাঁড় করাব। তিনি সে কথা শুনবেন না। তাঁর ঐ এক কথা, চাকরি কর। ড্যাম্‌ ইয়োর চাকরি! চাকরি আমি করব না। নো, নেভার, আমি বিজনেসই করব। বিজনেস!

মায়া। আচ্ছা আচ্ছা তুমি বিজনেসই কর।

অলক। নিশ্চয়ই করব! আলবাৎ করব যদি কিছু করি বিজনেসই করব।

মায়া। বৌদি কেমন আছেন সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। সেই এক রকমই।

মায়া। চল, দেখে আসি।

[মায়া আর সন্ধ্যা ভেতরে গেল, অনিল বাইরে থেকে ঢুকল]

অনিল আরে অলকবাবু যে! এত সকালে আমাদের বাড়িতে—

অলক ঐ মায়াটা ধরে নিয়ে এল।

অনিল [অত্যন্ত উৎসাহে] তাই নাকি! মায়া এসেছে নাকি?

অলক হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন না। বাবা ওর জন্য পাত্র দেখছেন।

তা হোক, দেখলেই পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার জন্যও দাদা পাত্র দেখছেন।

অলক। [সমান উৎসাহে] তাই নাকি?

অনিল। ব্যস্ত হবেন না। দেখছেন বলেছি, পেয়েছেন বলিনি। দেখা আর পাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ।

অলক। হ্যাঁ তা বটে। তা বটে।...আচ্ছা অনিলবাবু···যদি কাঠকে কয়লার মত ছোট ছোট করে সাপ্লাই করা যায়, তা হলে লোকে কয়লার বদলে কাঠ ব্যবহার করতে পারে তো?

অনিল। তা পারে!

[অনিল ভেতরে যেতে চাইলে অলক তার হাত চেপে ধরে]

অলক। না, না, ওরকমভাবে জবাব দিলে চলবে না। আপনি আমার কথাগুলো ভালোভাবে শুনে একটা সুচিন্তিত মত দিন।

অনিল। [অসহায় সুরে] বলুন।

অলক। আচ্ছা, কাঠের ব্যবসা আর মাছের ব্যবসার মধ্যে কোন্‌টা বেশী লাভজনক বলে আপনার মনে হয়?

অনিল। মাছের।

অলক। কেন?

অনিল। বাঙালী মেছো, তাই।

অলক। কিন্তু আমার মনে হয় কাঠের ব্যবসাই বেশী লাভজনক।

অনিল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অলক। কেন?

অনিল। বলতে পারি না।

অলক। কেন বলতে পারেন না?

অনিল। তাও বলতে পারি না। হ্যাঁ, বলতে পারি, যদি ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসতে পারি।

অলক। বেশ যান। কিন্তু কেরাণীগিরি করবেন না। ওতে কোন প্রস্‌পেক্ট নেই। বিজনেস করবেন বিজনেস।

[অনিল ভেতরে যেতে গেল]

আর একটা কথা—

[অনিল বিরক্তমুখে দাঁড়াল]

আপনার বোন সন্ধ্যা কি আমার পার্টনার হতে পারেন না?

অনিল। কিসের পার্টনার? আপনার লাইফ-এর, না, আপনার বিজনেস-এর!

অলক। আপনি আমার কথাগুলো একদম সিরিয়াসলি নিতে পারছেন না।

অনিল। সত্যি, আপনার কথাগুলো আমি একদম সিরিয়াসলি নিতে পারছি না।

অলক। ইয়ং এজ্-এ সমস্ত সিরিয়াস কথা সিরিয়াসলি নিতে পারা যায় না। আচ্ছা আমি চললাম···আমাকে একবার মার্কেট-এ যেতে হবে। কাঠের দর আর মাছের দরটা কত করে যাচ্ছে তা জানতে হবে। [একটু এগিয়ে] হ্যাঁ, আপনি আমার সিস্টারকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারেন না ?

অনিল। খুব পারি। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই পারি।

অলক। থ্যাঙ্ক ইউ !

[রাজেশ্বর ঢুকল]

রাজেশ্বর। কে তুমি ?

অলক। [ভীত স্বরে] আমি ! আমি অলক !

রাজেশ্বর। অলক ! অলক কে ?

অলক। দ্বারিকবাবুর ছেলে।

রাজেশ্বর. এ বাড়িতে তোমরা ঘন ঘন আস কেন ? হোয়াই তোমরা আসবে—চা খাবে, খাবার খাবে ? আর অমিয় ধার করবে ? আর ধার শোধের জন্য অমিয় কোনদিন অফিসের টাকা ভাঙবে না ? ডোণ্ট কাম্। ডোণ্ট কাম্ টু দিস্ হাউস।

[অলক চলে যেতে গেল]

ওয়েট। কি কর তুমি ? চাকরি ? সাবধান ! খুব মনোযোগ দিয়ে

কাজ করবে। আদার-ওয়াইজ্ ইউ মে লুজ ইয়োর সার্ভিস্ ওয়ান ডে। তখন বৌ ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। বুঝেছ? যাও।

[অনিলের ইসারায় অলক চলে গেল। অনিলও ভেতরে প্রস্থানোদ্যত হল]

রাজেশ্বর। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

অনিল। ভেতরে।

রাজেশ্বর। ভেতরে কেন? বাইরে যা। বাইরে। বেরিয়ে পড়। এ বাড়িতে থাকিস না। পালা। পালা। [প্রস্থান]

অনিল। এ্যাঁ! পালালেই হলো কিনা! বাড়িতে থেকেই তুবেলা জুটছে না। আর বাইরে গিয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরি আর কি!

[অনিল বসল। মায়া আর সন্ধ্যা ঢুকল। অনিল তাড়াতাড়ি একখানা বই টেনে নিল]

মায়া। দাদা কোথায় গেল?

[অনিল চুপ করে রইল]

সন্ধ্যা। অলকবাবু কোথায় গেলেন ছোড়দা?

অনিল। ঠিক বলতে পারি না। চলে গেলেন বোধ হয়।

সন্ধ্যা। তুমি তা হলে মায়াকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস।

অনিল। এই তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা। একাই বাড়ি চলে যাক।

সন্ধ্যা। তুমি দিয়ে এস।

অনিল। আমার এখন সময় হবে না। আমি পড়ছি।

সন্ধ্যা। যাও! খুব হয়েছে! আর পড়ার ভান করতে হবে না। [বইটা কেড়ে নিয়ে] যাও। দিয়ে এস!

অনিল। বেশ, দিয়ে আসতে পারি, যদি তোমাদের ও একটা গান শোনায়।

মায়া। না, না, আমি গাইতে পারব না।

অনিল। তা হলে আমিও বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব না।

মায়া। আমার গান গাইতে লজ্জা করে।

অনিল। আমার কিন্তু তোমার গান শুনতে বেশ ভালো লাগে।

সন্ধ্যা। দাদা এখুনি খেতে বসবেন।

অনিল। তা হোক, দাদা গান শুনতে ভালোবাসেন।

সন্ধ্যা। বৌদির অসুখ না!

অনিল। আচ্ছা, ফর এ মিনিট, আমি এখুনি দাদা, বৌদি, পাড়া প্রতিবেশীর যে যেখানে আছে সব্বাইকার পারমিশান নিয়ে আসছি। কিন্তু ওর গান না শুনে আমি ছাড়ছি না।

[প্রস্থান]

সন্ধ্যা। কি গান গাইবি?

মায়া। তুমি যা বলবে তাই।

সন্ধ্যা। একটা প্রেমের গান শুনিয়ে দে।

মায়া। ধ্যেৎ!

সন্ধ্যা। কেন রে? ছোড়দা তো তোকে ভালোবাসে আর তুইও তো...

[মায়া সন্ধ্যার বুকে মুখ লুকাল]

ছোড়দার মতন মানুষকে ভালোবাসতে নেই রে। ওর মত ছেলেকে ভালোবাসলে দুঃখ পেতে হয়।

[অনিল ঢুকল]

অনিল। সব্বাইকার পারমিশান পাওয়া গেছে। এখনই একটা গান হয়ে যাক।

[মায়া লজ্জিতভাবে গান গাইল]

গান

ভেবেছিলাম বাঁধবো আমার বীণা
পথিক যবে আসবে ওগো দ্বারে
দিনগুলি মোর সুরের গানে
কাটবে তারে ঘিরে।
দিন হতে দিন হলো হারা
ভাবনা শুধু হলো সারা
রইল বীণাখানি যেমন ছিল পড়ে,
তারগুলি তার আপনা হতে
কখন গেল ছিঁড়ে।
পথিক সে এল না তো
ব্যর্থ হল সাধনা তো
তাইত' দুয়ার বন্ধ করি ধীরে—
পথিক সে যে আসবে না মোর দ্বারে।

সন্ধ্যা। হল তো শোনা! যাও, এখন পৌঁছে দিয়ে এস।

অমিয়। [নেপথ্যে] সন্ধ্যা! ভাত দিয়ে যা রে।

[সন্ধ্যা ভেতরে চলে গেল]

মায়া। গান কেমন লাগল বললে না তো!

অনিল। ফার্স্ট ক্লাস লাগল! তবে কেমন যেন করুণ! অমন কেঁদে কেঁদে গান কর কেন?

মায়া। তোমারও কান্না পায় তাহলে!

অনিল। হ্যাঁ দেখ, তোমার বাবা তেমন লোক সুবিধের নয়!

মায়া। [হেসে ফেলে] কেন?

অনিল। কেন আবার! অত করে বললাম যে তোমার বিয়েটা আমার সঙ্গে দিয়ে দিতে। কিন্তু আমার বেকার নাম না ঘুচলে তিনি কিছুতেই রাজী নন!

মায়া। [একটু এগিয়ে এসে] একটা চাকরি করলেই তো পার।

অনিল। তুমি তো একটা বিয়ে করলেই পার।

মায়া। [ম্লান হেসে] আমাকে কে বিয়ে করবে বল?

অনিল। আমারও ঠিক ঐ জবাব। আমাকে কে চাকরি দেবে? যাকৃগে, চাকরি আমি পাই না পাই তোমাকে আমি বিয়ে করবই করব। দাদাকে বাড়িভাড়ার হাত থেকে রেহাই···

মায়া। আমাকে বিয়ে করতে চাও দাদার বাড়িভাড়ার দেনা মেটাবে বলে?

অনিল। আরে না না, এ-ছাড়া আরও কারণ আছে—যা তুমি বুঝবে না।

মায়া। বুঝবার সময় আমার হয়েছে। আমি কালো বলে—

অনিল। তুমি কালো বলে নিজেকে খুব ছোট মনে কর, না!

মায়া। হ্যাঁ করি। গরীবের ঘরে কালো হয়ে জন্মান যে কত বড় অভিশাপ তা তুমি বুঝবে না।

অনিল। আর গরীবের ঘরে বেকার হয়ে দিন কাটান যে কতখানি মর্মান্তিক তা তুমিও বুঝবে না !

মায়া। তুমি জান না অনিলদা, কতবার কতলোক আমাকে দেখতে এসেছে। সেজেগুজে গিয়ে বসেছি। হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকে ঐ এক জবাব দিয়ে গেছে—মেয়ে বড় কালো, পছন্দ হল না। নয়ত চাইল দশহাজার টাকা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বিষ খেয়ে মরি !

অনিল। তা তোমাকে যাতে বিষ খেয়ে না মরতে হয়, তার জন্যে তোমায় আমি বিয়ে করতে চাইলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তোমার বাবা রাজী হলেন না। আমি বেকার, আর একটা কারণ তিনি বলেননি, আমি বকাটে বলে।

মায়া। [কাছে এসে] না, না, বাবা তোমাকে ও রকম ভাবেন না !

অনিল। ভাবেন বই কি ! শুধু তোমার বাবা নয়। অনেকেই ভাবে। কিন্তু কেন আমি বেকার···সে কথা তো কেউ ভাবে না। দরজায় দরজায় তিন বছর ঘুরেও চাকরি না পেয়ে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়েছি মনের দুঃখে। মনের কষ্ট হাসি-তামাশা দিয়ে ঢেকে রাখি। লোকে তাই ভাবে আমি বকে গেছি—বেকার বকাটে ছেলে আমি। [চোখে জল ঘনিয়ে আসে]

মায়া। এ কি অনিলদা, তোমার চোখে জল !

অনিল। [নিজেকে সামলে, জোরে হেসে উঠে] দেখলে তো কিরকম এ্যাক্‌টিং করলাম। হেঁ···হেঁ বাবা···একদিন দেখবে দিস্ অনিল

লাহিড়ী হ্যাজ বিকাম এ গ্রেট এ্যাণ্ড গ্রেট আর্টিষ্ট। তখন তোমার ঐ···যাক্‌গে ও সব তুমি বুঝবে না চল।

[উভয়ে চলে গেল, সন্ধ্যা ও অমিয় ঢুকল। সন্ধ্যার হাত থেকে পান নিয়ে অমিয় খেয়ে নিল]

অমিয়। তাহলে আমি অফিস চললাম।···নিখিলটা কোথায় রে ?

সন্ধ্যা। বৌদির কাছে বসে আছে বোধ হয়।

অমিয়। নিখু! নিখু!

[নিখিল ঢুকল]

নিখিল! তোর কটা নাগাদ রেজাল্ট বেরোবে ?

নিখিল। দুপুরে তো শুনেছি।

অমিয়। বেশ। তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যাস! আর খবর পেয়েই একদম বাড়ি চলে আসবি। কোথাও আড্ডা মারবি না। [একটু এগিয়ে] শুনছি নাকি মাত্র ত্রিশ পারসেণ্ট পাশ করিয়েছে।

নিখিল। হ্যাঁ দাদা।

অমিয়। তা হোক। তোর জন্যে আমি ভাবি না। যে ছেলের দিনরাত বই মুখে, তাকে ঠেকায় কে ?···কিরে তোর মুখ-চোখ শুকনো লাগছে কেন ?

নিখিল। কেমন যেন ভয় করছে।

অমিয়। ভয় কি! এ্যাঁ ভয় কিসের আবার ? আমি আজ তিনটের সময় ছুটি করে চলে আসব। মাইনের দিন। এক চ্যাংড়া খাবার নিয়ে আসব। সব্বাই মিলে আনন্দ করা যাবে।

[মাণিক স্কুলের পোষাকে ঢুকল]

অমিয়। কি, ইস্কুল যাচ্ছিস ?

মাণিক। হ্যাঁ।

অমিয়। মাস্টার মশাইকে বলে তাড়াতাড়ি চলে আসবি। বুঝলি ? আজ তোর ছোটকাকার পাশের খবর বেরোবে।

মাণিক। বারে কাল বললাম না ? আজ মাস্টার মশাই আমাদের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন।

অমিয়। তাই নাকি ? আচ্ছা বেশ দেখিস, যেন চিড়িয়াখানার কোন ঘরে থেকে যাস নে।

মাণিক। বয়ে গেছে আমার থাকতে ! [একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে এসে] বাবা, কই জামা কিনে দিলে না তো ! এই ছেঁড়া জামা পরে ইস্কুলে যেতে লজ্জা করে।

অমিয়। আচ্ছা কাল-পরশু ঠিক কিনে এনে দেব। হ্যাঁ শোন, ছেঁড়া জামা-কাপড় পরতে লজ্জা পাস নে। আমাদের চাইতেও গরীব আছে যাদের ছেঁড়া জামা-কাপড়ও জোটে না।

মাণিক। আর কোনদিন বলব না বাবা !

[মাণিক বাইরে চলে গেল]

অমিয়। আমি চললুম তাহলে। তোর বৌদির ওপর একটু নজর রাখিস সন্ধ্যা। ওর শরীরটা আজ তত ভালো নয়।

সন্ধ্যা। আচ্ছা। তুমি বরঞ্চ একবার অমল ডাক্তারকে বল বৌদিকে দেখে যেতে।

অমিয়। আচ্ছা বলব'খন।

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

অমিয়। দেখ তোর বৌদি আবার কেন ডাকছে।

সন্ধ্যা। যাই। চল নিখিল, খেয়ে নিবি চল।

[সন্ধ্যা আর নিখিল ভেতরে গেল। দ্বারিকনাথ ঢুকলেন]

দ্বারিক। বাবাজীর কি অফিস যাওয়া হচ্ছে? এঃ, তাহলে তো বড় বেটাইমে এসে পড়লাম। তা আর কি করব বল, সকালে এলাম! তোমার ভায়া তো তাড়িয়েই দিল। তা বাবাজী বাড়িভাড়ার টাকাটা—তিন মাসের ওপর হয়ে গেল বাড়িভাড়া বাকী। কাল তো মাসের শেষ তারিখ গেছে, মাইনে পেয়েছ। তাই এলাম।

অমিয়। কাল আমাদের মাইনে দেয়নি। আজ দেবে। আপনি বরঞ্চ বিকেলের দিকে একবার আসবেন। আর মায়াকেও সঙ্গে আনবেন। আজ নিখিলের রেজাল্ট বেরোবে। সবাই মিলে একটু আনন্দ করা যাবে।

দ্বারিক। বাবাজীবন, বারবার টাকার তাগিদ দেই বলে তুমি হয়ত আমার সম্বন্ধে কত কি ভাব—না!

অমিয়। না, না, সে কি কথা!

দ্বারিক। কি করব বল বাবাজী। তোমারই মত আমারও সংসারে যে অভাব লেগে আছে। পেন্সনের আর তোমার এই বাড়িভাড়ার টাকা দিয়ে ছ-ছ'টা প্রাণীর পেট চালাতে হয়। নয়ত বারবার তাগাদা দিতে আমারও কেমন লাগে।

অমিয়। তা আমি জানি দ্বারিকবাবু। আপনার মত মহৎ লোক সংসারে বিরল।

দ্বারিক। আমি মহৎ লোক কি না জানি না। তবে এটা জেনো সংসারে মহৎ লোকের অভাব নেই। তা নইলে গোটা সমাজটা কবে ভেঙে পড়ত। আচ্ছা তুমি বরঞ্চ অফিসের দিকে পা বাড়াও। আমি একটু জিরিয়ে নিই।

অমিয়। আচ্ছা।

[অমিয় বেরোল, দ্বারিকনাথ বসলেন]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] নিয়ে গেল! চুরি করে নিয়ে গেল! ধর ধর ওকে।

[একটু পরেই সমর ঢুকল]

সমর। [দ্বারিককে] অমিয় আছে নাকি?

দ্বারিক। [সমরকে আগ্রহের সঙ্গে দেখতে দেখতে] না, বাবাজীবন তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল। তা তোমার সঙ্গে পথে দেখা হয়নি?

সমর। না তো!

দ্বারিক। তা বেশ! তা বস না বাবাজী! দাঁড়িয়ে কেন?

[সমর বসে একটা বই পড়তে লাগল]

তা তোমাকে তো এ-বাড়িতে কখনও দেখিনি?

সমর। আজ্ঞে না। বহুদিন বাদে আজ প্রথম আসছি।

দ্বারিক। ওঃ, [একটু চুপচাপ] অমিয় বুঝি তোমার বন্ধু?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বারিক। আমি হলাম এ-বাড়ির বাড়িওয়ালা।

সমর। ওঃ!

দ্বারিক। কি করা হয় বাবাজীর?

সমর। ব্যবসা।

দ্বারিক। তা কথাটা ভালো দেখায় না, মানে রোজগারপাতি ?

সমর। ঠিক নেই।

দ্বারিক। কলকাতায় বাড়ি আছে ?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বারিক। বাপ মা ?

সমর। বেঁচে আছেন।

দ্বারিক। ব্রাহ্মণ ?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বারিক। কোন শ্রেণীর ?

সমর। বারেন্দ্র।

দ্বারিক। [অত্যন্ত খুশিতে] বেশ ! বেশ ! তা বিয়ে করেছ তো

সমর। [বিরক্ত হাসির সুরে] এর পরে আর কি জিজ্ঞেস করবেন বলুন তো ?

দ্বারিক। [কাষ্ঠ হাসি হেসে] হেঁ-হেঁ—বাবাজীর যেন রাগ হয়েছে ব।। মনে হল ! যাক, থাক তাহলে আর কিছু জিজ্ঞেস করব না। [উঠে] তবে বাবাজী ! বিয়ে যদি না করে থাক করে ফেল। বিয়ে না করলে জীবন পূর্ণ হয় না। আর বিয়ে করবার সময় শুধু মেয়ের দিকে নয়, মেয়ের বাপগুলোর দিকেও একটু নজর রেখ।

[একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।]

[একটু পরে সন্ধ্যা ঢুকল]

সন্ধ্যা। এই যে সমরবাবু এসে গেছেন। ভালোই হয়েছে? কতক্ষণ এসেছেন? দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সমর। না, তোমাদের বাড়িওয়ালার সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম।

সন্ধ্যা। সকালে উত্তেজনার বশে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

সমর। কই? মনে করবার মত কিছু তো বলনি।

সন্ধ্যা। ঐ যে চাকরির কথা বলছিলাম তার আর দরকার নেই।

সমর। চাকরি অবশ্য তোমাকে করে দিতে পারতাম কি না জানিনে তবে চেষ্টা নিশ্চয়ই করতাম। তা ছাড়া তোমার দাদা যখন চান না—

সন্ধ্যা। বাড়ির কোন পুরুষই চায় না যে তার বাড়ির মেয়েরা চাকরি করতে যায়। তবু যায়, যেতে হয় বলেই!

সমর। তা জানি।

সন্ধ্যা। আমাকেও যেতে হবে। আজ নয় কালকে।

সমর। তবু যতদিন না যেতে হয়, ততদিনই ভালো।

সন্ধ্যা। তা হয়তো হবে। চলুন খেয়ে নেবেন চলুন।

সমর। চল।

[দুজনে চলে গেল। নিখিল ঢুকল। পেছন পেছন রাজেশ্বর]

রাজেশ্বর। ইউ বয়! কোথায় যাচ্ছ?

নিখিল। আজ আমার এগজামিনের রেজাল্ট বেরোবে। তাই—

রাজেশ্বর। ওঃ! পাশ করতে পারবি ?

নিখিল। পারব।

রাজেশ্বর। কিন্তু পাশ করে লাভ কি ? রোজগার করতে পারবি ?

নিখিল। চেষ্টা করব।

রাজেশ্বর। চেষ্টা করব ? আজ তোর মতন হাজার হাজার ছেলে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আই নো দ্যাট্ ইউ শ্যাল অলসো বি ওয়ান অব দেম, তাহলে পাশ করে লাভ কি ? বেকারত্ব···হো হো···আচ্ছা যা। বাট্ আই নো, কোন লাভ নেই। কোন লাভ নেই। [নিখিল প্রস্থানোদ্যত] এই, তোর দিদি কাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল রে ?

নিখিল। সমরদাকে।

রাজেশ্বর। সমরদা! হু ইজ হি ?

নিখিল। দাদার বন্ধু!

রাজেশ্বর। ও, দ্যাট্ সমর! ও আবার এসেছে ? ওকে বললাম না এ-পরিবারের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না ? কথা শুনল না। বুঝেছি...হি ইজ এ ব্যাড এলিমেণ্ট। তোর দাদাকে বলিস ওকে যেন ঢুকতে না দেয়।

[রাজেশ্বর ভেতরে চলে গেল, নিখিল গেল বাইরে। হাসতে হাসতে সন্ধ্যা আর সমর ঢুকল]

সন্ধ্যা। খেয়ে আপনার পেট ভরল না। না ?

সমর। হ্যাঁ, তাইত ভাবছি রাত্রে আর খাব কি না!

সন্ধ্যা। রাত্রে না খাবার মত এমন কিছু খাননি!

সমর। আচ্ছা চলি।

সন্ধ্যা। [হঠাৎ বলে ফেলা ভাবে] আবার কবে আসবেন ?

সমর। যেদিন, যখন বলবে—

সন্ধ্যা। [লজ্জিত সুরে] ওঃ, ভুলেই গেছি। দাদা আপনাকে আজ বিকেলে আসতে বলেছেন।

সমর। আজ বিকেলেই !—কেন ?

সন্ধ্যা। নিখিলের আজ রেজাল্ট বেরোবে। তাই বিকেলে সকলে মিলে একটু······

সমর। বেশ আসব। মিষ্টির লোভে যত না তার চাইতেও······ [অনিল ঢুকতেই সমর কথা ঘুরিয়ে নিল] নিশ্চয় আসব বিকেলে। মিষ্টির লোভ কি আর ছাড়া যায় ! এই যে অনিল কোত্থেকে ?

অনিল। এই একজনকে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

সমর। আমি তাহলে এখন চলি সন্ধ্যা। চলি অনিল।

অনিল। আর যাবার কি দরকার সমরদা ! এইখানেই একটু গড়িয়ে নিন না। দাদার আসতে আর কতক্ষণই বা !

সমর। না, না, একটু কাজ আছে। সেরে আসি এই ফাঁকে।

[প্রস্থান]

অনিল। বিকেলে আসবেন কিন্তু।

সমর। [নেপথ্য থেকে] আসব।

অনিল। হ্যাঁ রে, মিষ্টির চাইতে লোভ সমরদার এখানে কি করবার আছে রে ?

সন্ধ্যা। দেখ ছোড়দা! সব সময়েই তোমার ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না। চল খাবে চল।

অনিল। আমি খাব না। খেয়ে এসেছি।

সন্ধ্যা। কোত্থেকে? মায়াদের ওখান থেকে বুঝি?

অনিল। হ্যাঁ, আমিও খাব না, মায়াও ছাড়বে না। শেষকালে আমারই হার হল। খেয়ে তবে আসতে হল।

সন্ধ্যা। খুব হয়েছে। যেচে খেয়ে এসে এখন কথা ঘোরান হচ্ছে।

অনিল। হ্যাঁ সকলেই তোর সমরদা কি না!

সন্ধ্যা। [কপট রাগে] ছোড়দা, আবার!

[অনিল হেসে ভেতরে চলে গেল]

[সুনীল ঢুকল]

সুনীল। সন্ধ্যা! আছিস এ-ঘরে?

সন্ধ্যা। এই যে আমি এখানে।

সুনীল। দাদা অফিস চলে গেছে, না?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ।

সুনীল। কটা বাজে?

সন্ধ্যা। এগারটা।

সুনীল। এগারটা বেজে গেল···সবাই এখন কাজ করছে! আর আমি···আমিই শুধু···

সন্ধ্যা। তুমি খেয়ে নেবে চল।

সুনীল। খেতে আমার ভালো লাগে না।

সন্ধ্যা। কেন? কি হয়েছে?

সুনীল। এমনি করে বসে বসে আর কতদিন খাব বল ?

সন্ধ্যা। [অভিমানাহত সুরে] বেশ খেও না। আমিও খাব না।

সুনীল। রাগ করিস না। সত্যি ভালো লাগে না খেতে। কে যেন গলাটা চেপে ধরে।

সন্ধ্যা। না তোমাকে খেতেই হবে।

সুনীল। বেশ চল। [একটু এগিয়ে] হ্যাঁ রে, যদি আমার চোখটা হঠাৎ ভালো হয়ে যায় ? আগের মত সব দেখতে পাই ? যদি আমিও কুলি-মজুরী করেও কিছু রোজগার করে আনতে পারি তাহলে বেশ হয়, না ?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ মেজদা।

সুনীল। [কম্পিত সুরে] কিন্তু হবে না। আমি জানি কোনদিন তা হবে না।

[সুনীল ও সন্ধ্যা চলে গেল। অনিল ঢুকল। হাত পা ছড়িয়ে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল। জগৎবাবু ঢুকলেন]

জগৎ। এই যে অনিল ! ঘরে বসে যে !

অনিল। হ্যাঁ এই আছি বসে। বেকার মানুষ। কোথায় আর যাব !

জগৎ। বেশ ! [বসে নিজের হাত দেখতে লাগল]

অনিল। নিজের হাত কি দেখছেন ?

জগৎ। আচ্ছা অনিল ! দৈব বড়, না পুরুষকার বড় ?

অনিল। লেখা-পড়া বিশেষ জানা নেই। তাই ও-সব বড় বড় কথার মানে বুঝিনে।

জগৎ। হাত দেখতে জান ?

অনিল। না।

জগৎ। [নিজের হাত বাড়িয়ে] দেখ তো! এই এটা হচ্ছে অর্থ-প্রাপ্তির রেখা। বুঝলে! বেশ স্পষ্ট লাগছে না?

অনিল। আজ্ঞে না।

জগৎ। ওঃ! [মুখ শুকিয়ে গেল] আচ্ছা তোমার হাতটা দেখি? [হাত টেনে নিয়ে] ওঃ নাইস্!

অনিল। কি হল, ব্যাপার কি?

জগৎ। ওঃ, নাইস্! ইউ আর এ লাকী চ্যাপ, অনিল, ইউ আর এ লাকী চ্যাপ। ওয়াণ্ডারফুল!

অনিল। আহা ব্যাপারটা খুলেই বলুন না! আমি যে আর ধৈর্য রাখতে পারছি না!

জগৎ। তুমি শীগগির মোটা টাকার মালিক হচ্ছ!

অনিল। [হাত টেনে নিয়ে] ছাড়ছেন তো!

জগৎ। ছাড়ছি মানে!

অনিল। গুল ছাড়ছেন।

জগৎ। তার মানে?

অনিল। মানে পরিষ্কার। আমার টাকা পাবার কোন আশা নেই।

জগৎ। কে বলেছে নেই? কে বলেছে নেই? আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তুমি ছ'মাসের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নিদেন বিশ-হাজার টাকার মালিক হচ্ছ।

অনিল। কিন্তু কেমন করে? দিনে দুপুরে ডাকাতি করবার সাহস আমার নেই।

জগৎ। কিচ্ছু করতে হবে না। স্রেফ তোমাকে সাড়ে তিন টাকা খরচ করতে হবে। এই নাও। ফর্মগুলো ফিল্-আপ করো।

অনিল। ওঃ! লটারীর টিকিট!

জগৎ। হ্যাঁ, এইটা হল রেঞ্জার্স—দু'টাকা! ফার্স্ট প্রাইজ যত কমই দিক ত্রিশ হাজার! এইটা ত্রিপুরা চ্যারিটী—এক টাকা! ফার্স্ট প্রাইজ অন্ততঃ কুড়ি হাজার। আর এইটে হল আট আনা। ফার্স্ট প্রাইজ পাঁচ হাজার!

অনিল। এ-সব খড়ম-পেটা কপাল। ও-সব রেঞ্জার্স ফেঞ্জার্স লাগবে না।

জগৎ। কে বলেছে লাগবে না! আশাবাদী হতে হবে। নিরাশ হয়ে থাকলে তুমি কিছুই করতে পারবে না। নাও। ফিল্-আপ কর। আহা, টাকা যদি নাই থাকে—পরে দিও। লাক্ ইজ লাক্। [অনিল অনিচ্ছায় ফর্ম ফিল্-আপ করতে লাগল, জগৎবাবু বলে চললেন] এই দেখ না আমার এক পরিচিত লোক বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পেল। যে-সে কথা নয়! ফর্টি-টু থাউজেণ্ড রূপীজ! কিন্তু হলে কি হয় ভদ্রলোক মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। ওয়াইন এ্যাণ্ড উইমেন তাঁর সব টাকা নিয়ে গেল। ভদ্রলোক এখন একটা বিড়ির দোকান করেছেন। অথচ ঐ টাকা যদি আমি পেতাম!...ফিল্-আপ করা হয়েছে? দাও। [ফর্মগুলো নিয়ে] হ্যাঁ, দেখ, আই অ্যাম্ শিয়োর তুমি রেঞ্জার্স পাচ্ছ। বাট্ বি ভেরী কেয়ারফুল, টাকাগুলো হাতে পেয়ে যেন নষ্ট করে দিও না।

অনিল। আপনি দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ডাব পেড়ে ফেললেন।

জগৎ। এই তো ব্রাদার! এই তো তোমাদের দোষ! এই ধর না ইংরেজদের কথা। যুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে কি না হয়েছে! বসে গেল পোস্ট-ওয়ার প্ল্যান নিয়ে। আর সেই প্ল্যানমতই তো আমরা স্বাধীন হলাম। যাকগে, যা বলছিলাম, টাকাগুলো হাতে পেয়ে যেন নষ্ট করে দিও না। জাস্ট টেক মাই অ্যাড্ভাইস্। হ্যাঁ, আমি আরও আশা করছি, যে-টাকা তুমি পাবে তার অ্যাট লিস্ট টেন পার্সেণ্ট তুমি আমাকে দেবে। আচ্ছা চলি, বারোটা বাজতে চলল···আমাকে আবার—[হঠাৎ ঘুরে এসে] আমাকে অন্ততঃ আট আনা পয়সা দিতে পার?

অনিল। কিন্তু আমার কাছে তো একটা পয়সাও নেই!

জগৎ। ওঃ, নেই! আচ্ছা থাক। বুঝলে না, ছেলেটা বড় বায়না ধরেছে কমলা লেবু খাবে। কিন্তু এমন পয়সা নেই যে কিনে দিই একটা—যাকগে···উইশ ইউ গুড লাক্··· [দ্রুত প্রস্থান]

[সন্ধ্যা ঢুকল]

সন্ধ্যা। ছোড়দা কি করছ?

অনিল। তেমন কিছু না। মাত্র দু'টাকায় ত্রিশ হাজার টাকা কি করে পাওয়া যায় তারই প্ল্যান দিচ্ছিলেন জগৎদা।

সন্ধ্যা। দু'টাকায় ত্রিশ হাজার টাকা! ক্ষেপে গেলে নাকি?

অনিল। আচ্ছা, যখন ত্রিশ হাজার টাকা পাব তখন দেখে নিস।

[ভেতরে চলে গেল, অলক ঢুকল]

অলক। এই যে সন্ধ্যা দেবী, একটা বিশেষ পরামর্শের জন্যে আবার আপনার কাছে এলাম।

সন্ধ্যা। [হেসে] আমার সঙ্গে পরামর্শ! আর লোক পেলেন না!

অলক। হাসির কথা নয়। সিরিয়াস্‌লি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, প্রাইভেট লিমিটেড করব না পাব্লিক লিমিটেড করব?

সন্ধ্যা। কিসের!

অলক। কেন? আপনি আমার 'গভীর সমুদ্রের কাঁকড়া ধরা' প্ল্যানের কথা জানেন না?

সন্ধ্যা। না তো!

অলক। আমি তো নেক্সট্ জাহাজেই আন্দামান যাচ্ছি। আন্দামান থেকে নিকোবর। নিকোবর থেকে নানকৌড়ি। শুনছি সেখানে আধমণের উপর ওজনের কাঁকড়া পাওয়া যায়। সেখান থেকে কাঁকড়া ধরে পাঠিয়ে দেব মাদ্রাজে। আবার মাদ্রাজ থেকে সেইসব কাঁকড়া প্যাক করে ফরেন-এ চালান দেব। কেমন হবে বলুন তো?

সন্ধ্যা। বেশ চমৎকার!

অলক। [অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে] আমি জানি আপনি নিশ্চয়ই আমার স্কীমটা অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন। শুধু একটা নয়। এই ধরণের হাজার হাজার স্কীম আমার মাথার ভেতরে ঘুরছে। বুঝেছেন আমাদের দেশ থেকে মুখ্যু কতকগুলো মাড়োয়ারী লাখ লাখ টাকা কামাবে! অথচ আমরা—আই মিন বাঙ্গালীরা—তাদের কাছে গিয়ে কেরাণীগিরি করব! দ্যাট আই কাণ্ট টলারেট।

বাঙ্গালীরা যদি আমার প্ল্যান মত চলে তাহলে উইদিন টেন ইয়ার্স বাঙ্গালী একটা বণিক জাতিতে পরিণত হবে। আচ্ছা আমি চলি। আমাকে এক্ষুনি একবার···[একটু এগিয়ে, আবার ফিরে এসে] দেখুন সন্ধ্যা দেবী, একটা কথা আপনাকে অনেক দিন থেকেই বলব বলব মনে করছি অথচ ঠিকমত বলতে পারছিনে।

সন্ধ্যা। কেন বলুন তো! এই তো আপনার বিজনেসের প্ল্যানগুলো বেশ পরিষ্কারভাবেই বললেন।

অলক। ঐতো মজা! বিজনেস সম্বন্ধে যে-কোন কথা বলতে আমার একদম বাধে না। অথচ আমি আপনাকে যে-কথা বলতে চাই সেটা ঠিক বিজনেসের কথা নয়! অথচ যদি বলতে পারি আর আপনি রাজী হন তাহলে তা আমার বিজনেসকে যথেষ্ট হেল্প করবে।

সন্ধ্যা। বেশ বলুন না!

অলক। ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন? ব্যাপারটা হচ্ছে···মানে ঐ আর কি···মানে পুরুষ আর নারীর মধ্যে যে···না থাক বলব না। বলা উচিত নয়।

সন্ধ্যা। খুব উচিত, বলুন!

অলক। যতদিন না নিজেকে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে খানিকটা এসটাব্লিশ্ করতে পারি···যতদিন না কিছু রোজগার করতে পারি···ততদিন একথা আপনাকে আমি বলতে পারিনে। বলা উচিত নয়।

সন্ধ্যা। তা হোক। আপনাকে বলতেই হবে।

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! একবার এদিকে এস।

সন্ধ্যা। দাঁড়ান এক মিনিট। বৌদি কেন ডাকছেন দেখে আসি।

[প্রস্থান]

অলক। [আপন মনে] বলব? না থাক! উনি কি ভাববেন! তা ছাড়া ও-সব ভাবনা আমার ভাবলে চলবে না। আমাকে বিজনেস করতে হবে, বিজনেস! বলব? না থাক! না, বলেই ফেলি! বলব যে সন্ধ্যা দেবী আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই! আমি আপনাকে—

[জগৎ ঢুকল]

জগৎ। অনিল? বলছিলাম কি টাকাটা পরশুদিন হলে—[অলককে দেখে ভুল বুঝে] ওঃ! সরি!

অলক। না, না, দুঃখিত হবার কিছু নেই। টাকার কথা বলছিলেন না! ঠিক বলেছেন! দুনিয়ায় খেতে গেলে, পরতে গেলে, বিয়ে করতে হলে টাকা চাই। সামান্য মাসে একশ দেড়শ হলে চলবে না। চাই অ্যাট লিস্ট ওয়ান থাউজেণ্ড, আর তা কামাতে হলে চাকরি করলে চলবে না। করতে হবে বিজনেস। আপনি কি বলেন?

জগৎ। আমি···আমি···মানে, আমি হলাম 'হোল ওয়ার্ল্ড লটারী টিকেট সেলিং এম্পোরিয়াম'-এর কমিশন এজেণ্ট।

অলক। [আগ্রহের সঙ্গে] তাই নাকি?

জগৎ। আপনি কি করেন? বিজনেস?

অলক। [বিব্রত সুরে] এখনও করিনি। তবে বিজনেস-এর স্কীম আছে।

জগৎ। [অবজ্ঞার সুরে] স্কীম!

অলক। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্কীম। একটা দুটো নয়! মোর দ্যান এ ডাজন্! বুঝলেন না, বিজনেস করাটা এমন কিছু নয়। কিন্তু কি বিজনেস করবেন সেটা ঠিক করাই শক্ত।

জগৎ। ঠিক বলেছেন! এই ধরুন না আমার কথা। বর্তমানে আমি যা করছি তা করবার আগে কত কি করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই সুবিধে করতে পারিনি। অথচ এখন ধরুন আমার দৌলতে কতলোক পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে।

অলক। [অত্যন্ত আনন্দের সুরে] তাই না কি? আচ্ছা আপনি আমার বিজনেস-এ টাকা ইনভেস্ট করতে চান?

জগৎ। ওঃ, ইয়েস! তেমন বিজনেস হলে কেন করব না? গ্ল্যাডলি করব। কত হলে চলবে?

অলক। এই হাজার পঞ্চাশ টাকা।

জগৎ। আমি আপনাকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।

অলক। [একটু ভেবে] আচ্ছা ঐতেই হবে। আপনার ক্যাপিট্যাল, আমার লেবার।

জগৎ। প্রফিটের শেয়ার?

অলক। ফিফটি-ফিফটি।

জগৎ। বাঃ! তা কেমন করে হবে? আমার সিক্সটি আপনার ফরটি।

অলক। আচ্ছা ঠিক আছে। টাকাটা আপনি কবে নাগাদ দিতে পারবেন?

জগৎ। কবে দরকার ?

অলক। যত তাড়াতাড়ি হয়। সে, উইদিন এ উইক।

জগৎ। উইদিন এ উইক ? আচ্ছা দাঁড়ান। [পকেট থেকে কাগজ বার করে, আপন মনে] ড্রইং হচ্ছে থার্টিন্‌থ্‌, রেস হচ্ছে সিক্সটিন্‌থ্‌, তা টাকা পেতে পেতে মাসের শেষ। [অলককে] হ্যাঁ, দেখুন এক মাসের আগে টাকা দিতে পারছি না।

অলক। [হতাশার সুরে] এক মাস ?

জগৎ। হ্যাঁ, তা প্রায় এক মাস। এক মাসের কিছু বেশীও লাগতে পারে। রেঞ্জার্সের ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়েই……

অলক। [রেগে] কি বললেন ?

জগৎ। রেঞ্জার্সের ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়েই আপনার টাকাটা—

অলক। [অত্যন্ত রেগে] নন্‌সেন্স !

জগৎ। [সমান রেগে] শাট্‌ আপ ! ইউ আর এ নন্‌সেন্স !

অলক। [বেরিয়ে যেতে যেতে] ইউঃ !

[দুজনে ঝগড়া করতে করতে বেরিয়ে গেল, সন্ধ্যা ঢুকল]

সন্ধ্যা। অলকবাবু ! এইবার—ওঃ চলে গেছেন দেখছি !

[প্রস্থানোদ্যত। রাজেশ্বর ঢুকলেন]

রাজেশ্বর। সন্ধ্যা !

সন্ধ্যা। কি বলছ বাবা ?

রাজেশ্বর। হ্যাঁ রে, বৌমা এখনও বেঁচে আছে ? বৌমা !

সন্ধ্যা। কি বলছ তুমি বাবা ? বৌদি তো ভালোই আছে !

রাজেশ্বর। নো, নো, সে ভালো থাকতে পারে না। নো, শি উইল ডাই। আজ নয় কাল। শুধু ও একা নয়। এ-ফ্যামিলির সবাই।…না…না…শুধু এ-ফ্যামিলি নয়। হোল মিডল-ক্লাস ফ্যামিলি উইল পেরিশ। কেন জানিস? দারিদ্র্য! পভার্টি, পভার্টি!

সন্ধ্যা। বাবা!

রাজেশ্বর। ইয়েস্ পভার্টি! তুই কান্না শুনতে পাস না?

সন্ধ্যা। কার?

রাজেশ্বর। কার আবার? সারা বাংলার? সারা বাংলার মানুষগুলোর কান্না? শুনতে পাস না? কি তুই? মানুষগুলো মরছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর মরছে……

[প্রস্থানোদ্যত, হঠাৎ দাঁড়িয়ে]

সেই ছেলেটা কেন আসে রে? থ্যাট্ চ্যাপ,…কি যেন নাম?

সন্ধ্যা। সমরবাবু।

রাজেশ্বর। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন সে এখানে আসে রে?

সন্ধ্যা। দাদার বন্ধু, তাই।

রাজেশ্বর। বিশ্বাস করিস নে। বিশ্বাস করিস নে ওকে। আমি বলছি ও ভালো ছেলে নয়। একদিন তোদের পথে বসাবে। ডোণ্ট বিলিভ ইন এ স্ট্রেঞ্জার, ডোণ্ট বিলিভ। নিয়ে যাবে… তোর সব চুরি করে নিয়ে যাবে…সব নিয়ে যাবে, সব!

[রাজেশ্বরের প্রস্থান। সন্ধ্যা বিমর্ষমুখে বসে রইল। সুনীল ঢুকল]

সুনীল। কি হয়েছে রে সন্ধ্যা? জ্যাঠামশাই কি বলছিলেন?

সন্ধ্যা। [বিমর্ষতা কাটিয়ে] কিছু না মেজদা!

সুনীল। [বসে] দাদার বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন না?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ।

সুনীল। মনে হয় বেশ ভালো লোক। দাদা বোধ হয় ওঁর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে। বেশ হবে না!

[নেপথ্যে রাধার গোঙানি শোনা গেল]

সন্ধ্যা, বৌদির অসুখটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। একটু আগে বৌদির কাছে গিয়ে বসেছিলাম। কি বলছিল জানিস?

সন্ধ্যা। কি?

সুনীল। বলছিল, আমি আর বাঁচব না ঠাকুরপো। তোমার দাদাকে বারণ করো যেন আমার জন্যে আর পয়সা খরচ না করে।

সন্ধ্যা। সত্যি। বৌদির মত মেয়ে হয় না। মানুষটা অত যে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ কোন দিন ভুলেও বলে না আমার কষ্ট হচ্ছে। মেজদা একজন বড় ডাক্তার···[কথাটা ঘুরিয়ে] জান মেজদা, বড়দা বলেছে একজন বড় ডাক্তার······

সুনীল। কথা ঘোরাবার চেষ্টা করিস নে বুঝলি? আমি সব বুঝি। বড় ডাক্তার বড়দা কোনদিনই আনতে পারবে না। এত বড় সংসার বড়দাকে একা টানতে হয়। অথচ আমি এতটুকু সাহায্য করতে পারিনে।

সন্ধ্যা। সে দোষ তো তোমার নয়, মেজদা!

সুনীল। নয়! বেঁচে থাকাটাই তো আমার দোষ! কেন আমি বেঁচে আছি বলতে পারিস? ভগবান আমার চোখদুটো কেড়ে

নিয়ে কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখল ? কেন ? কেন ? কেন ?

[সুনীল ভেতরে চলে গেল। অমিয় এক ঠোঙা খাবার নিয়ে ঢুকল]

সন্ধ্যা। এ কি বড়দা তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে ?

অমিয়। বলেই তো গিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি আসব। নিখিল বাড়ি এসেছে ?

সন্ধ্যা। না তো !

অমিয়। সে কি রে ? তিনটে বেজে গেছে। নিখিল এখনও বাড়ি আসেনি ?

সন্ধ্যা। হয় তো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছে।

অমিয়। না, না, তা কেমন করে হবে ? আমি যে ওকে বলেছিলাম, কোথাও যাস নে !

সন্ধ্যা। তাহলে বোধ হয় এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। বিকেলের দিকে বেরোবে।

অমিয়। এ্যাঁ…হ্যাঁ…তা হতে পারে।

[সন্ধ্যাকে খাবারের ঠোঙা দিল। সন্ধ্যা ভেতরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিল ঢুকল]

অমিয়। এই যে অনিল ! একটা সুখবর আছে বুঝলি ?

অনিল। কি ব্যাপার বল ত ?

অমিয়। তিন তারিখ থেকে অফিসে একটা নতুন পোস্টে একজন গ্র্যাজুয়েটকে নেবে। তা সাহেবকে গিয়ে আজ ধরলুম নিখিলকে নেবার জন্যে। সাহেব এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

অনিল। [বিমর্ষ সুরে] নিখিল চাকরি করবে তো—আর আমি কি চিরকাল বেকার হয়ে দিন কাটাব? [ভাঙা গলায়] একটা বেয়ারার চাকরিও তো—

অমিয়। আরে না…না…বেকার হয়ে থাকবি কেন? নিখিলের চাকরিটা হোক, তারপর তিনমাসের মধ্যে ঐ গলির মোড়ে তোকে একটা স্টেশনারী দোকান করে দেব।

[ডাক্তার ঢুকল]

এই যে ডাক্তারবাবু…এসে গেছেন? আসুন।

[অমিয় ও ডাক্তার ভেতরে চলে গেল। গোয়ালা ঢুকল]

অনিল। কি রে, কি ব্যাপার?

গোয়ালা। এই লাও বাবু। তোমার মাডাল লিয়ে লাও।

অনিল। কেন রে? বিক্রী হল না বুঝি?

গোয়ালা। বিক্রী আর হোবে না কেন বাবু। তবে কি জানো বিক্রী করতেই যে গেলম না।

অনিল। গেলিনে কেন?

গোয়ালা। বাবু আজ পন্‌দ্র বছর ধরে তোমাদের দুধ দিচ্ছি। বচপনমে তোমাকে দেখলম। আর তোমার ঐ সোখের জিনহিস্‌টা হামি বিক্রী করে দেব? পাপ হোবে না বাবু! টাকা আজ নেহি তো কাল তো মিলবে!

অনিল। আরে বাবা মানুষকে অত বিশ্বাস করতে নেই। মেডেলটা নিয়ে যা না। শেষকালে কিছুই পাবি নে।

গোয়ালা। দেখো বাবু, হামার পিতাজী বললো ভদ্দর আদমিকে বিশোয়াস করে ঠোকা ভালো। লেকিন অবিশোয়াস করতে নেই। এই লাও।

অনিল। খুব হয়েছে। যা নিয়ে যা। আজকের দিনে টাকাটাই বড় কথা বুঝলি!

গোয়ালা। বাবু!

অনিল। যা বলছি শোন।

[জোর করে মেডেলটা দিয়ে দিল। গোয়ালা অনিচ্ছা সহকারে চলে গেল। ডাক্তার ও অমিয় ঢুকল]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] কেউ বাঁচবে না···কেউ না!

অমিয়। কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। দেখুন অমিয়বাবু, অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই সময় যদি হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর বোসকে একবার দেখান তাহলে খুবই ভালো হয়।

অমিয়। ডক্টর বোস-এর ভিজিট?

ডাক্তার। বত্রিশ টাকা। তাহলে ওষুধ কেউ নিয়ে আসবেন চলুন!

অমিয়। চলুন আমিই যাচ্ছি।

[অমিয় যেতে গেল]

অনিল। তোমাকে যেতে হবে না দাদা। আমি যাচ্ছি। তুমি বরঞ্চ হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে নাও। চলুন ডাক্তারবাবু!

[অনিল ও ডাক্তার চলে গেল। নেপথ্যে সমর]

সমর। [নেপথ্যে] অমিয়! অমিয়!

অমিয়। কে সমর! এস! এস!

[সমর ঢুকল]

তারপর! খাওয়া-দাওয়া ভালো হয়েছিল তো?

সমর। ভালো বলে ভালো! ভোলবার নয় একেবারে। তারপর নিখিল পাশ করেছে?

অমিয়। না, নিখিল এখনও আসেনি। কেন যে এত দেরী করছে! ...সন্ধ্যা! সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। [নেপথ্যে] যাই দাদা।

অমিয়। তাড়াতাড়ি আয়! সমর এসেছে। [সমরকে] আচ্ছা তুমি একটু সন্ধ্যার সঙ্গে গল্প কর। আমি হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড়টা ছেড়ে আসি।

সমর। আচ্ছা বেশ।

[অমিয় চলে গেল, সন্ধ্যা ঢুকল]

সন্ধ্যা। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।

সমর। বেশ যা হোক! আমি বাড়ি গিয়েই ভাবছি কখন আসব, কখন আসব...আর তুমি কি না—

সন্ধ্যা। কথাটা আপনি কিন্তু বাড়িয়ে বলছেন।

সমর। বিশ্বাস কর। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি নে।

সন্ধ্যা। এতটা আগ্রহের কি কারণ থাকতে পারে বলুন তো!

সমর। বলব—[একটু থেমে] তুমি!

সন্ধ্যা। [চাপা আনন্দে] আমি!

সমর। [আবেগের সুরে] হ্যাঁ তুমি! এত অল্প সময়ের পরিচয় তোমার সঙ্গে—তবু যেন মনে হচ্ছে তোমাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি, অনেকদিন ধরে জানি।

[সন্ধ্যা লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করল]

সন্ধ্যা। [তেমনি চাপা আনন্দে] এটা আপনার মনের ভুলও তো হতে পারে।

সমর। না। ভুল নয়। জীবনে আমি অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছি। কিন্তু তোমার মধ্যে যা দেখেছি তা কারোর মধ্যে দেখিনি।

[সমর আস্তে এগিয়ে এসে সন্ধ্যার কাঁধে হাত রাখল]

সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা। [অভিভূতের সুরে] কি?

সমর। কি বলি বল তো!

সন্ধ্যা। আপনার যা ইচ্ছে।

সমর। অনেক কথাই তো বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কি দিয়ে শুরু করু. তা বুঝতে পারছি নে।

[হঠাৎ অলক ঢুকল]

অলক। দেখুন সন্ধ্যা দেবী, তখন যে কথাটা…

[ওদের ঐভাবে দেখে]

ওঃ সরি!

[চলে যেতে গেল। সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।]

সমর। [বিব্রত স্বরে] চলে যাচ্ছেন যে!

অলক। আপনাদের ডিস্টার্ব করতে চাই নে।

[আবার চলে যেতে গেল]

সমর। শুনুন।

অলক। [রাগ আর অভিমান মাখান স্বরে] আমার একদম সময় নেই। আমাকে দুদিন বাদে বিজনেস করতে হবে। বিজনেস!

সমর। তাই নাকি? কিসের বিজনেস?

অলক। সেটা জেনে আপনার লাভ?

সমর। বললেনই বা! ক্ষতি কি!

অলক। কেন বলব! আপনি বিজনেস-এর কি বোঝেন?

সমর। [অল্প হেসে] আমিও যে বিজনেস করি।

অলক। [হঠাৎ আগ্রহের স্বরে] কিসের?

সমর। প্রিন্টিং-এর।

অলক। [আনন্দিত কণ্ঠে] বিউটিফুল! [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে] কিসের বললেন? প্রিন্টিং-এর? রাবিশ! ও বিজনেস-এ কোন প্রস্পেক্ট নেই।

সমর। তাই নাকি?

অলক। আজ্ঞে হ্যাঁ। তাছাড়া আমি আপনাকে এরই মধ্যে যা স্টাডি করলাম, তাতে মনে হয় আপনার বিজনেস করা উচিত নয়।

সমর। কেন?

অলক। কেন আবার! বিজনেস করতে হলে আপনাকে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। আপনাকে বাইরে বেরোতে হবে। হাঁটতে

হবে। ঘুরতে হবে। তবেই বিজনেস-এ আপনি শাইন করতে পারবেন, তা নইলে নয়! আপনি অন্দরমহলে বসে…

সমর। [কথাটার ইঙ্গিত বুঝে] অমিয় আমার বন্ধু! আজ হঠাৎ…

অলক। বুঝতে পেরেছি। আমার বোন মায়া যদি সুন্দর হত তাহলে আমারও আপনার মত অনেক বন্ধু জুটত।

[অলক দ্রুত চলে গেল! সমর এসে বসল চেয়ারে। একটু পরে দ্বারিকনাথ মায়াকে নিয়ে ঢুকল]

দ্বারিক। অমিয় এসেছ নাকি!…এই যে বাবাজীবন বাড়ি যাও নি? এখানেই বুঝি খাওয়া-দাওয়া—

সমর। [বিব্রত স্বরে] এ্যাঁ—হ্যাঁ—তা একরকম বলতে পারেন! খাওয়া-দাওয়াটা এখানে করে একটু ঘুরে আবার এলাম। অমিয় বলেছিল—

দ্বারিক। তা আসবে বই কি! নিশ্চয়ই আসবে। বন্ধুর বাড়ি। সেতো একরকম নিজেরই বাড়ি। এটি আমার মেয়ে মায়া। [মায়াকে] কিরে লজ্জা কিসের? অমিয়দার বন্ধু! সমরবাবু!

দ্বারিক। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! বুঝলে বাবাজীবন, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

সমর। এখনও বিয়ে হয়নি?

দ্বারিক। কই আর হল! গরীবের ঘরের কালো মেয়ে কে বিয়ে করবে বল? কতবার যে মেয়েটাকে দেখালাম তার ইয়ত্তা নেই। অথচ…

[অনিল ওষুধ হাতে ঢুকল]

অনিল। আরে বাবা···মায়া নাকি ?···তুমি আবার এ-বাড়িতে— কি ভাগ্য আজ সারাদিনই···[হঠাৎ দ্বারিকনাথকে দেখে] বৌদি তোমার নাম করছিলেন—বলছিলেন তোমাকে ডেকে আনতে। তা ভালোই হল। ডাকতে হল না। চল, চল। ভেতরে চল।

[অনিল মায়াকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] কেউ বাঁচবে না···কেউ না···ধর ধর ওকে···

দ্বারিক। মায়াকে কেমন দেখলে ?

সমর। সত্যিই আপনার মেয়ে প্রশংসা করবার মত।

দ্বারিক। [হঠাৎ সমরের হাত চেপে ধরে] বাবাজীবন। তুমি মায়াকে গ্রহণ কর।

সমর। তা হয় না। তা হয় না দ্বারিকবাবু!

দ্বারিক। বাবাজীবন! মায়া গরীবের মেয়ে বটে। কিন্তু ওর মন রাজরাণীর চাইতেও বড়। ওকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে। আমি বলছি তুমি সুখী হবে।

[সমর ইতস্ততঃ করতে লাগল]

সমর। আমি বুঝি বিয়ে করে হয়তো সুখী হব। কিন্তু মায়াকে বিয়ে করবার কোন উপায় নেই।

দ্বারিক। [হাত ছেড়ে দিয়ে ভিজে গলায়] ওঃ, বাবাজীবন তুমি কিছু মনে কর না।

[অমিয় ঢুকল]

অমিয়। এই যে দ্বারিকবাবু—আপনি এসে পড়েছেন···সকলেই তো এসেছে! কিন্তু যার জন্যে আসা সেই এল না। অনিল··· অনিল···

[অনিল ঢুকল]

অনিল। কি বলছ দাদা ?

অমিয়। যা তো একটু এগিয়ে দেখ তো নিখিলটা আসছে কি না ?

অনিল। [অনিচ্ছায়] ভাবছ কেন ? নিখিল এক্ষুনি এসে পড়বে।

[ভেতরে যেতে গেল]

অমিয়। তোকে যা বলছি শোন না!

অনিল। বেশ যাচ্ছি।

[বাইরে চলে গেল]

অমিয়। সমর, একটা কথা সকাল থেকেই ভাবছি। বলব ?

দ্বারিক। বল না বাবাজী! বলা যায় না, হয়তো তোমার কথা তোমার বন্ধু রাখতেও পারে।

সমর। বেশ তো বল না। রাখবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।

অমিয়। তুমি তো জান অনেক চেষ্টা করেও সন্ধ্যার বিয়ে আজও আমি দিতে পারিনি। তুমি যদি সন্ধ্যাকে—

[অমিয় সমরের হাত চেপে ধরতে গেল। এমন সময় অনিল ঢুকল]

অনিল। দাদা, নিখিল আসছে।

অমিয়। [প্রচণ্ড আনন্দে] এঁ্যা, সন্ধ্যা, নিখিল আসছে ? এদিকে আয়। কোথায় যে গেল খাবারের ঠোঙাটা···দ্বারিকবাবু, নিখিল যদি সুখবর দিতে পারে তাহলে মাইনের সব কটা টাকা—

[নিখিল ঢুকল]

কি রে পাশ করতে পেরেছিস তো ? [উচ্চৈঃস্বরে] কথা বলছিস না যে ? পাশ করতে পেরেছিস ?

নিখিল। [কান্নায় ভেঙে পড়ে] না বড়দা, আমি ফেল করেছি !

অমিয়। [বজ্রাহত স্বরে] এঁ্যাঃ, বলছিস কি ? ফেল করেছিস ? [হঠাৎ রেগে] লজ্জা করে না তোব ফেল করে বাড়িতে ঢুকতে ? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে······

নিখিল। [তেমনি ভাঙা কান্নায়] বাড়ি থেকে চলেই যাব বড়দা, চলে আমি নিশ্চয়ই যাব।

[ঘরের ভেতরে চলে গেল]

অমিয়। [প্রায় আপন মনে] ইস্, ফেল করল ! আমার এত-দিনকার আশা ও ভেঙে চুরমার করে দিল।

অনিল। ফেল করবে না তো কি ! পড়বে না মন দিয়ে—

অমিয়। তুই থাম তো ! ফেল করবে এ তো আমি জানতুম। আদ্দেক বই কিনে দিতে পারিনি। এক মাসের জন্যেও একটা মাস্টার রাখতে পারিনি। তার ওপর র‍্যাশান আনা, ওষুধ আনা, মাণিককে পড়ান। ফেল করবে না তো কি ! যা ওকে নিয়ে আয়। একবার ফেল করেছে তো কি হয়েছে ? ওকে আমি আবার পড়াব। যা ডেকে নিয়ে আয় ! দেখিস তুই যেন কিছু বলিস নে।

অনিল। পাগল হয়েছ দাদা! তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল-করা ছেলে আমি। আমি বলতে যাব ওকে!

[অনিল ভেতরে চলে গেল]

সমর। অমিয়! আমি তাহলে এখন চলি!

অমিয়। এ্যাঁ, আচ্ছা। সন্ধ্যের দিকে একবার এস সমর। তোমার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা—অথচ প্রাণ খুলে দুটো কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না। কি, আসবে তো?

সমর। বেশ, আসব। চলি! [সমর ধীরে চলে গেল]

অমিয়। দেখলেন তো দ্বারিকবাবু কত আশা করেছিলাম যে নিখিলটা—

[অনিল দ্রুত ঢুকল]

অনিল। বড়দা নিখিলটাকে তো কোথাও দেখতে পেলাম না। বোধ হয় পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে।

অমিয়। সে কি রে?

অনিল। নিশ্চয়ই তাই। ওর সুটকেশটাও দেখতে পেলাম না।

অমিয়। নিখিলটা শেষকালে পালাল?…পালিয়ে গেল ও!…ওঃ …দেখলেন দ্বারিকবাবু! এত কষ্ট করে মানুষ করলাম…আর ও কিনা…

[পরেশ নামে জনৈক যুবকের দ্রুত প্রবেশ]

পরেশ। দ্বারিকবাবু কি এখানেই আছেন?

দ্বারিক। এই যে আমি এখানে! কি ব্যাপার বল তো পরেশ?

পরেশ। কাকাবাবু, অলকদার—

দ্বারিক। অলকের কি হয়েছে ?

পরেশ। অলকদার ভীষণ অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

দ্বারিক। অ্যাকসিডেণ্ট! বল কি! কি হয়েছিল ?

পরেশ। সে সব কথা আপনি পরে শুনবেন কাকাবাবু! এখন আপনি শীগগির চলুন!

অমিয়। অলক কোথায় ?

পরেশ। হসপিটালে। চলুন কাকাবাবু আর দেরী করবেন না। আর কিছু টাকা নিন। অলকদাকে ব্লাড দিতে হবে।

দ্বারিক। ওঃ [টাকার জন্যে জিজ্ঞাসুভাবে] অমিয়!

অমিয়। অনিল, শীগ্‌গির ও-ঘর থেকে আমার অফিসের জামাটা নিয়ে আয়। জামার পকেটেই টাকাগুলো আছে।

[অনিল চলে গেল। একটু পরেই জামা নিয়ে ঢুকল]

অমিয়। [জামার পকেট খুঁজতে খুঁজতে] পকেটে তো টাকাগুলো দেখতে পাচ্ছি নে। কোথায় গেল ?

অনিল। নেই ?

অমিয়। না তো!

অনিল। কই দেখি ? [পকেটে হাত দিয়ে] এ কি তোমার পকেট তো কাটা দেখতে পাচ্ছি!

অমিয়। এ্যাঁঃ......

[অমিয় নিরুপায়ভাবে দ্বারিকনাথের দিকে তাকাল]

দ্বারিক। ওঃ আচ্ছা। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন। তুমি বরঞ্চ নিখিলের একটু খোঁজ করো।

পরেশ। কাকাবাবু! আর দেরী করবেন না।

দ্বারিক। এ্যাঃ, হ্যাঁ চলো...[মায়া ঢুকল] এই যে মায়া! চল্ চল্। হসপিটালে যেতে হবে। অলকের নাকি ভীষণ অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

মায়া। কি বলছ তুমি বাবা!

দ্বারিক। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, চল্, তোর দাদা বোধ হয় এপারের ব্যবসা চুকিয়ে ওপারে ব্যবসা করতে চলেছে। চল্ আর দেরী করিস নে।

[অমিয় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ছুটে এসে দ্বারিকবাবুর হাত ধরল]

দ্বারিক। বুঝেছি আর বলতে হবে না। চল্ মায়া! চল পরেশ।

[দ্বারিকবাবু, মায়া ও পরেশ চলে গেল। অমিয় মাথা নীচু করে বসে রইল]

অমিয়। নিখিলটা সত্যিই পালিয়েছে, না?

অনিল। তা নইলে আর সুটকেশে ভরে জামা-কাপড়গুলো নিয়ে যাবে কেন? বল...

অমিয়। যাক্‌গে...ওর মত অকৃতজ্ঞ ছেলেদের বাড়িতে না থাকাই ভালো...একবার আমাদের কথা ভাবল না হতভাগাটা...

অনিল। আমার মত বসে বসে অন্ন ধ্বংস করার চাইতে ওর যাওয়াই ভালো।

অমিয়। এই সময় আবার টাকাগুলো গেল! সারা মাস কি করে যে সংসার চালাই!...দ্বারিকবাবুর দরকারের সময় ওঁর পাওনা টাকা দিতে পারলাম না...টাকার অভাবে হয় তো—[অস্থিরভাবে

ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে] কিছু টাকা এনে দিতে পারিস নে অনিল! কিছু টাকা! কি তুই! দিনরাত বাড়িতে বসে আছিস। রোজগার-পাতি করবার নাম নেই। দরকারের সময় ক'টা টাকা জোগাড় করে আনতে পারিস নে! কি তোরা!

[অনিলের মুখে চোখে দৃঢ়তা ফুটে উঠতে লাগল]

কোথায় যাচ্ছিস?

অনিল। টাকা আনতে।

অমিয়। কোত্থেকে আনবি?

অনিল। যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক।

[দ্রুত প্রস্থান করল]

অমিয়। অনিল শোন। [আপন মনে] বাবুর রাগ হয়ে গেল! দুটো কথা কি বলেছি আর না বলেছি তেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

[সুনীল ঢুকল]

সুনীল। দাদা!

অমিয়। কি?

সুনীল। নিখিল বুঝি পালিয়ে গেছে?

অমিয়। হ্যাঁ।

সুনীল। কোথায় গেল? একটু খোঁজ করলে না?

অমিয়। খোঁজ করবার দরকার নেই। দুদিন বাদে আবার আসবে!

সুনীল। অনিল কোথায় গেল?

অমিয়। জানিনে।

সুনীল। জানো না? নিখিল চলে গেল। অনিলটাও কোথায় গেল। যাদের যাবার কথা নয়, তারাই চলে যাচ্ছে। আর আমি···আমি তো কোথাও যেতে পারলাম না।

অমিয়। [ভাঙা কান্নায়] বেশ তো, যা না! তোকে কে থাকতে বলছে? তোরা সবাই চলে যা! সবাই যা!

সুনীল। আর যেই পারুক, আমি তো যেতে পারব না দাদা! ভগবান যে আমাকে মেরেছেন। কোনদিন কোন সাহায্যই আমি তোমাদের করতে পারব না···সারাজীবন তোমাদের গলগ্রহ হয়েই আমাকে কাটাতে হবে···সারাজীবন···সারাজীবন···

[প্রস্থান]

[নেপথ্যে রাধার আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল।]

[সন্ধ্যা দ্রুত ঢুকল]

রাধা। আঃ!···আঃ!···আঃ! বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হচ্ছে।

সন্ধ্যা। বড়দা!

অমিয়। কি রে?

সন্ধ্যা। বৌদির অসুখটা বড় বেড়েছে।

অমিয়। বেড়েছে তো কি করব?

সন্ধ্যা। তুমি একবার চল।

অমিয়। আমি গিয়ে কি করব শুনি? এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিগে যা বরং। যা না! [সন্ধ্যা প্রস্থানোদ্যত] এই শোন! তোর বৌদির কোন গয়না নেই, না?

সন্ধ্যা। না।

অমিয়। তোর ?

[সন্ধ্যা ঘাড় নাড়লো—না]

রাধা। ঠাকুরঝি ! ঠাকুরঝি ! জানালা দরজাগুলো সব খুলে দাও। বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হচ্ছে।

[সন্ধ্যা প্রস্থান করল]

[জগৎবাবু ঢুকলেন]

জগৎ। [অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে] এই যে অমিয় ! ছ্যাখ তোমাদের ঐ যে অলকবাবু না কি নাম ! লোকটা একেবারে যা-তা ! আমাকে বলে কি না রাবিশ। নিজে রাবিশ কি না তাই। একটা ভদ্রতা জ্ঞান নেই লোকটার ! একবার যদি ওকে আমি পাই, তাহলে আমি বলব, আপনি একটি ইডিয়ট, আপনি একটি ব্লাফার। আপনি একটি—

অমিয়। বেশ তো যান না ? হাসপাতালে গিয়ে বলে আসুন না !

জগৎ। হাসপাতাল ! হাসপাতাল কেন ?

অমিয়। অলকবাবু অ্যাক্সিডেণ্টে মর মর।

জগৎ। [স্তম্ভিত স্বরে] হাসপাতাল ! মর মর ! বল কি ?

অমিয়। হ্যাঁ !

জগৎ। কিন্তু না না, তার মরা হতে পারে না। তাকে যে বিজনেস করতে হবে ! তার ব্রেণ, আমার ক্যাপিট্যাল। কোন্ হাসপাতালে বল তো ?

অমিয়। তা আমি জানিনে।

জগৎ। জানো না?···আচ্ছা আমি সব হাসপাতালে ট্রাই করব। তাকে আমি খুঁজে বার করবই! তার মরা হতে পারে না। তাকে যে বিজনেস করতে হবে! তার ব্রেণ, আমার ক্যাপিট্যাল।

[বলতে বলতে চলে গেল। রাজেশ্বর ঢুকল]

রাজেশ্বর। অমিয়! [ফিসফিসিয়ে] নিখিল নাকি পালিয়েছে? কথা বলছিস না যে! নিখিল পালিয়েছে? আই নো, নিখিল পালিয়েছে। বেশ করেছে! এই বদ্ধ হাওয়ায় থাকলে ওর দম বন্ধ হয়ে যেত। ও বেঁচেছে···ও পালিয়ে বেঁচেছে···

রাধা। [নেপথ্যে] আঃ···আঃ···আঃ···

[নেপথ্যে রাধার আর্তনাদ শুনে]

রাজেশ্বর। বৌমার অসুখটা বুঝি বেড়েছে? বাড়বেই···বাড়বেই··· এত বাড়বে যে আর বাড়বার সুযোগ পাবে না···

[সন্ধ্যার দ্রুত প্রবেশ]

সন্ধ্যা। বড়দা, তুমি শীগগির এস। বৌদি যন্ত্রণায় বড্ড ছটফট করছে।

অমিয়। তা আমি গিয়ে কি করব?

রাজেশ্বর। যা···যা···বৌমার কাছে গিয়ে বসগে যা! নয়ত ও কখন ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে···তুই জানতেও পারবি নে···

সন্ধ্যা। চল বড়দা।

অমিয়। চল।

[দুজনে চলে গেল]

রাজেশ্বর। কেউ না···কেউ বাঁচবে না···কেউ না···হা···হা···হা···

[ভেতরে চলে গেল। সন্ধ্যা ও অমিয় ঢুকল]

সন্ধ্যা। বৌদির অসুখ সত্যিই খুব বেড়েছে। তুমি যেমন করে পার ডক্টর বোসকে কল্ দাও।

অমিয়। কিন্তু বত্রিশ টাকা ভিজিট আমি কোথায় পাব?

সন্ধ্যা। ডাক্তারবাবুর কাছে খুলে বলো সব কথা। তিনি নিশ্চয়ই দয়া করবেন।

অমিয়। ভুলে যাস নে সন্ধ্যা! ডাক্তাররা ব্যবসাদার।

[অনিল এরই মধ্যে কখন ঢুকেছে ঘরের মধ্যে।
ভয়ে আর উত্তেজনায় ভীষণ হাঁপাচ্ছে]

সন্ধ্যা। তাহলে বৌদি কি বিনা চিকিৎসায় এমনি করে মারা যাবে!

অনিল। দাদা আমি টাকা এনেছি। এই নাও। [দশ টাকার কতকগুলো নোট দাদার পকেটে গুঁজতে গুঁজতে] যাও। তুমি শীগগির বৌদির জন্যে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

অমিয়। এত টাকা তুই কোত্থেকে পেলি?

অনিল। সে সব প্রশ্ন তুমি পরে করো দাদা—তুমি যাও।

অমিয়। না। কোত্থেকে টাকা পেলি না বললে যাব না।

রাধা। [নেপথ্যে] আঃ···আঃ...আঃ!

অনিল। এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনেছি।

অমিয়। সত্যি বলছিস?

অনিল। হ্যাঁ···হ্যাঁ···যাও দাদা আর দেরী করো না।

[অমিয়কে প্রায় জোর করেই বার করে দিল]

সন্ধ্যা। ছোড়দা, এত টাকা তুমি কোত্থেকে পেলে ঠিক করে বল তো ?

অনিল। বাজে কথা পরে জিজ্ঞেস করিস। যা এখন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় তো।

সন্ধ্যা। [দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে] ছোড়দা এত টাকা তুমি কোত্থেকে পেলে ঠিক করে বল তো ?

অনিল। বৌদি কেমন আছে ?

সন্ধ্যা টাকা কোত্থেকে পেয়েছ তাই বল।

অনিল। অলকবাবু কোন্ হাসপাতালে আছে রে ?

সন্ধ্যা। তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

অনিল। কি কথা ?

সন্ধ্যা। তুমি টাকা কোত্থেকে পেলে ?

অনিল। বারবার এক কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস বল তো ? যেখান থেকে পাই না কেন তোর কি ? তুই বৌদির কাছে গিয়ে বসগে যা।

সন্ধ্যা। না। টাকা কোত্থেকে পেয়েছ না বললে আমি কোথাও যাব না।

অনিল। বললুম তো ধার করে এনেছি।

সন্ধ্যা। তোমার এমন কোন বন্ধু নেই যে তোমাকে এত টাকা ধার দিতে পারে।

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি, ছোট ঠাকুরপো ফিরেছে ? তোমার বড়দাকে পাঠাও না একবার। না হয়—শোনো না এদিকে !

অনিল। যা না, বৌদি ডাকছে।

সন্ধ্যা। যাই বৌদি। [প্রস্থান]

রাজেশ্বর। [নেপথ্যে] পালাল! পালাল! চুরি করে পালাল!

অনিল। [চমকে, দু'হাতে মুখ ঢেকে] না, না, আমি পালাব না! পালাব না!

[সন্ধ্যা দ্রুত ঢুকল]

সন্ধ্যা। ছোড়দা, জানলা দিয়ে দেখলাম একদল লোক এদিকে আসছে। কেন বল তো?

অনিল। [অত্যন্ত ভীত হয়ে] এঁ্যাঃ তাই নাকি? দরজাটা বন্ধ আছে তো? সামনের দরজা? পেছনের দরজা?

সন্ধ্যা। কি হয়েছে সত্যি করে খুলে বল তো?

অনিল। এঁ্যাঃ···না। কিছু হয় নি তো! কি আবার হবে? বৌদির শরীর খারাপ তাই—চেঁচামেচি শুনলে হয় তো—

[নেপথ্যে গোলমাল]

১ম। এই যে, এই তো আমার স্যুটকেশ!

২য়। হ্যাঁ মশাই, আমি দেখেছি একজন ভদ্রলোক এর ভেতর থেকে কি সব বার করে বাইরে ফেলে দিলেন।

১ম। বলবেন না মশাই! দিন-দুপুরে হাত থেকে স্যুটকেশ টান মেরে ছুট!

৩য়। তাই নাকি! এসব ভদ্রবেশী চোরদের জেলে দেওয়া উচিত।

২য়। নিশ্চয়ই!

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ]

৩য়। বাড়িতে কে আছেন ?

[সন্ধ্যা বাইরে যেতে গেল। অনিল পথ আটকাল]

অনিল। না, না, দরজা খুলিস নে।

সন্ধ্যা। কেন ? কি হয়েছে ? কি করেছ তুমি ?

অনিল। [হঠাৎ চীৎকার করে] এখনও বুঝতে পারছিস নে, কি করেছি। দিন-দুপুরে লোকের হাত থেকে সুটকেশ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

[বাইরে ঘনঘন কড়া নাড়ার শব্দ]

নেপথ্যে। কি হল দরজা খুলুন না !

সন্ধ্যা। [গভীর অনুশোচনায়] ছোড়দা, শেষকালে তুমি চুরি করলে !

অনিল। হ্যাঁ করেছি। বেশ করেছি। চুরি করব না তো কি করব ? বাড়ির এই অবস্থায় কি চুপ করে থাকা যায় ?

সন্ধ্যা। ছোড়দা, তুমি পালাও। পেছনের দরজা দিয়ে—

অনিল। না, না, আমি পালাব না। ধরা দেব।

সন্ধ্যা। না, ছোড়দা তুমি পালাও।

অনিল। পালিয়ে যাব কোথায় ? খাব কি ? থাকব কোথায় ? তার চাইতে জেলই ভাল। খাওয়ার ভাবনা তো সেখানে ভাবতে হবে না। তুই দরজা খুলে দে।

নেপথ্যে। কে আছেন ভেতরে ? দরজা খুলুন। নয়ত দরজা আমরা ভেঙে ফেলব।

অনিল। সন্ধ্যা, দরজা খুলে দে।

[সন্ধ্যা গিয়ে দরজা খুলে দিল। উত্তেজিত ভাবে কয়েকজন ভদ্রলোক ঢুকলেন]

১ম। [অনিলকে] এই যে—এই ভদ্রলোকই তো আমার হাত থেকে স্যুটকেশ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন।

২য়। কি মশাই! আপনি এই ভদ্রলোকের হাত থেকে স্যুটকেশ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন ?

১ম। আর বলবেন না মশাই, পার্টির কাছ থেকে পেমেণ্ট নিয়ে টাকাগুলো যেই ব্যাগের মধ্যে রেখে হাঁটা দিয়েছি অমনি টান মেরে স্যুটকেশ নিয়েই ছুট!

৩য়। পাকা হাত দেখছি!

২য়। কথার জবাব দাও না বাপধন!

অনিল। কি জবাব দেব ?

২য়। তুমি এই ভদ্রলোকের হাত থেকে স্যুটকেশ ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ কি না ?

অনিল। 'তুমি' নয়, 'আপনি' বলুন! হ্যাঁ নিয়েছিলাম।

৩য়। এ্যাঁ! চোরের আবার আত্মসম্মান!

সন্ধ্যা। আপনারা দয়া করে আমার দাদাকে ক্ষমা করুন।

২য়। না, না, ও সব ক্ষমা-টমা নেই। ওঁকে আমরা পুলিশে দেব।

১ম। [অনিলের প্রতি] চলুন মশাই, থানায় চলুন!

অনিল। থানায় আপনারা না নিয়ে গেলেও আমি নিজেই যেতাম।

৩য়। ওরে বাবা, ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে!

অনিল। চলুন। [অনিল এগিয়ে গেল।]

[জনতা প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় সমরের প্রবেশ]

সমর। এ কি! কি ব্যাপার?

সন্ধ্যা। ছোড়দাকে এরা থানায় নিয়ে যাচ্ছে।

সমর। কেন?

অনিল। কেন আবার? আমি চুরি করেছি। আর চুরি করে ধরা পড়েছি তাই।

সমর। [ঘৃণার সঙ্গে] ছিঃ ছিঃ! তুমি শেষকালে চুরি করলে?

অনিল। হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি। করেছি। বাধ্য হয়েছি, তাই করেছি।

[প্রস্থানোদ্যত হল। একটু এগিয়ে আবার ঘুরে এসে]

সমরদা আমার একটা অনুরোধ রাখবেন!

সমর। বল।

অনিল। [২য়-র হাত ধরে] আপনারা দু'মিনিটের জন্যে বাইরে অপেক্ষা করুন। আপনাদের হাত ধরে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশ্বাস করুন। আমি পালাব না।

২য়। আচ্ছা চল হে চল। বাড়িটা ঘিরে থাকলেই হবে। পুলিশে তো খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এসে পড়ল বলে।

[সকলে চলে গেল]

অনিল। সমরদা আমার একটা অনুরোধ রাখবেন!

সমর। বল।

অনিল। আপনি সন্ধ্যাকে বিয়ে করুন।

সমর। কিন্তু—

অনিল। এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই সমরদা! আমি দাদার, সন্ধ্যার, বাবার, এ-সংসারের কারুর কোন উপকারই করতে পারি নি, আজ যাবার সময়—

সমর। [ইতস্তত করে] কিন্তু—

অনিল। না, না, আপনার কোন কথা শুনতে চাই নে। আপনি কথা দিন।

সমর। [অত্যন্ত বিব্রত সুরে] কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না অনিল, আমি···আমি এ পারি নে।

নেপথ্যে। কি মশাই! দু'মিনিট ছেড়ে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল যে!

অনিল। কেন? কেন পারেন না?

সমর। আমি···আমি···

অনিল। আমি কি?···

সমর। আমি বিবাহিত।

[সমর দ্রুত প্রস্থান করল]

অনিল। এঁ্যা···বিবাহিত! ···ওঃ···

[অনিল ধীরে ধীরে চলে গেল। সন্ধ্যা মুখ ঢেকে বসল]

রাধা। [নেপথ্যে] ঠাকুরঝি, মেজ ঠাকুরপোকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল রে? মেজ ঠাকুরপো নাকি চুরি করেছে? কথা বল! চুপ করে রয়েছিস কেন? কথা বল!

[সন্ধ্যা সেখানে বসে কাঁদতে লাগল। রাজেশ্বর ঢুকল]

রাজেশ্বর। সন্ধ্যা! শোন।

[সন্ধ্যা এগিয়ে এল]

অনিলকে ওরা পুলিশে দেবে বলে ধরে নিয়ে গেল, না? ধরে নিয়ে গেল! ছেড়ে দিল না? আমাকে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যা। [বিস্মিত স্বরে] বাবা!

রাজেশ্বর। হ্যাঁ রে! কোম্পানী আমাকে পুলিশে দিতে পারত। কিন্তু দিল না, খালি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিল। কেন জানিস? আমিও চুরি করেছিলাম!

সন্ধ্যা। কি বলছ বাবা!

রাজেশ্বর। সংসারের দেনা মেটাবার জন্যে আমিও চুরি করেছিলাম। আমি চোর···তা চোরের ছেলে চোর হবে না তো কি!

রাধা। [নেপথ্যে] ওঃ সন্ধ্যা, মেজ ঠাকুরপোকে ওরা ধরে নিয়ে গেল কেন? এদিকে আয় না! কথার উত্তর দিচ্ছিস নে কেন?

রাজেশ্বর। সন্ধ্যা, যা···যা···তোর বৌদির কাছে গিয়ে বসগে যা! বুঝতে পারছিস নে ও মরতে চলেছে। হোল মিড্‌ল্‌-ক্লাস ফ্যামিলি যেমন করে মরতে চলেছে। তেমনি করে ধীরে ধীরে···যা···যা···

[সন্ধ্যা চলে গেল···রাজেশ্বর আপন মনে বকতে লাগল]

রাজেশ্বর। কেউ না···কেউ বাঁচবে না···কেউ না···

রাধা। [নেপথ্যে] মেজ ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয় না। উনি কোথায় গেলেন?

সন্ধ্যা। [নেপথ্যে] বৌদি তুমি চুপ কর। তুমি চুপ কর।

রাধা। [নেপথ্যে] না, আমি চুপ করব না। ছোট ঠাকুরপোকে ডাক···মেজ ঠাকুরপোকে ডাক···আঃ···আঃ···

সন্ধ্যা। [তীব্রভাবে কেঁদে উঠে] বৌদি···বৌদি···

সুনীল। [নেপথ্যে] বৌদি চলে গেল সন্ধ্যা!

[কাঁদতে লাগল। বোঝা গেল রাধা মারা গেল। রাজেশ্বর হো হো করে হেসে উঠে—]

রাজেশ্বর। ফিনিশ্‌ড্‌! হা...হা...ফিনিশ্‌ড্‌...

[অমিয় ডাক্তার নিয়ে ঢুকল]

ডক্টর ইউ আর টু লেট! সি ইজ নো মোর···সি ইজ নো মোর···

[রাজেশ্বর ভেতরে চলে গেল। অমিয় ডাক্তারের হাতে ব্যাগটা দিয়ে দিল। ডাক্তার চলে গেল। অমিয় উইংসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। নেপথ্যে থেকে সন্ধ্যার কান্না ভেসে আসছে। অমিয় কাঁদছে। সুনীল ঢুকল।]

সুনীল। অনিল গেল! নিখিল গেল! বৌদিও চলে গেল! যাই···আমিও যাই! [সুনীল পা বাড়াল]

অমিয়। কোথায় যাচ্ছিস?

সুনীল। জানিনে।

অমিয়। তবু যেতে হবে!

সুনীল। হ্যাঁ।

অমিয়। কেন?

সুনীল। কেন?

অমিয়। হ্যাঁ কেন যাবি? কেন পালাবি?

সুনীল। কোথায় থাকব?

অমিয়। এইখানেই।

সুনীল। এখানে!

অমিয়। হ্যাঁ। চিরকাল এমনি যাবে না।

সুনীল। অন্যদিন আসবে!

অমিয়। নিশ্চয়ই!

সুনীল। সেদিন আমরা থাকব না।

অমিয়। ক্ষতি কি?

[মাণিক দ্রুত ঢুকল। বাবাকে, কাকাকে, ঐভাবে কাঁদতে দেখে, আর সন্ধ্যার কান্নার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল। তারপর ভীত কণ্ঠে চীৎকার করে—]

মাণিক। বাবা!

অমিয়। কে! মাণিক!

[মাণিক ছুটে এসে অমিয়র কোলে আশ্রয় নিল। 'অমিয় মাণিককে বুকের মধ্যে সজোরে চেপে ধরে]

অমিয়। এরা তো থাকবে!

[সুনীল ধীরে ফিরে এসে মাণিকের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে]

সুনীল। আমি যাব না বড়দা!

[সুনীল ভেতরে চলে গেল, ধীরে ধীরে পট নেমে এল। নেপথ্যে সাতটা বাজার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।]

॥ সমাপ্ত ॥